উৎসর্গ।

বঙ্গীয় সাহিত্যকাননে আপনি যে বৃক্ষের স্রষ্টিকর্ত্তা

সেই বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিয়া যে হার

গাঁথিয়াছি তাহার প্রথম স্তবক

আপনার চরণে প্রদান

না করিয়া আর

কাহার

চরণে দিব ? আশীর্ব্বাদ করুন,

আপনার চরণ তলে বসিয়া

দুই এক ছড়া

হার গাঁথিয়া

জগতে ধন্য

হই।

বিজ্ঞাপন।

—০:০—

অল্পকালের মধ্যেই আমাদিগের গ্রন্থকার নানা বিঘ্ন বিপত্তি বাধা কাটাইয়া বঙ্গসাহিত্য সংসারে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম অবগত নহেন এমন লোক বাঙ্গালা পুস্তক যাঁহারা পাঠ করা অপমান ও হীনতা মনে না করেন তাঁহাদের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাঁহাকে একজন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ণে পারদর্শী বলিয়া ও অনেকে তাঁহাকে তত্ত্ব বিদ্যায় সরলভাষায় পুস্তক প্রচার বিষয়ে বিশেষ দক্ষ বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু তিনি যে একজন উন্নত শ্রেণীর কবি ও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লেখক, তাহা অনেকে এখনও অবগত হয়েন নাই। যাঁহার প্রশংসা পাইবার অধিকার আছে, তাঁহাকে প্রশংসা না করা নীচতা মাত্র, আমরা তাঁহার রচিত পুস্তক প্রচার করিয়াছি বলিয়াই যে আমাদিগের

তাঁহার পুস্তকের ভাল মন্দের বিবেচনা শক্তি রহিত হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আমাদের অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার ঐতিহাসিক গল্প পাঠ করিয়াই তাঁহার এ বিষয়ে কিরূপ অধিকার তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই "ঐতিহাসিকগল্প" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সমস্ত নিঃশেষিত হওয়ায়, আমি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

পাঠকগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে আমাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, এবারেও সেইরূপ করিলে শ্রম অর্থব্যয় সফল মনে করিব। তাহা হইলে গ্রন্থকারও দ্বিগুণিত উৎসাহে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হয়েন, আমরাও এইরূপ উৎসাহও আগ্রহের সহিত শীঘ্র শীঘ্র পাঠক পাঠিকাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

২০নং যোড়াবাগানষ্ট্রীট।
আশ্বিন, ১৮৮৬ সাল।

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

—০০—

ঐতিহাসিক গল্প।

কুন্দজানি বেগম।

(১)

আমেদাবাদের সন্নিকটে একটী ভগ্নাবশেষ উদ্যান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বোধহয় অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্রাধিপতী শিবজীকে দমনে রাখিবার জন্য মহাপরাক্রান্ত আরঙ্গজিব বাদসাহ বৎসরের অধিকাংশকাল দিল্লিতে না থাকিয়া আমেদাবাদে বাস করিতেন। আজ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের নিকট তাঁহার সামান্য কবর দৃষ্টিগোচর হয়। যে উদ্যানের কথা বলিলাম, ঐ উদ্যান আরঙ্গজিব বাদসাহের জনৈক বেগমের বাসভূমি ছিল। ঐ উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী ভগ্নাবশেষ "ফুয়ারা" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ ফুয়ারার নিম্নে একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী শ্লোক পারসিভাষায় লিখিত আছে। শ্লোকটী অনুবাদ করিলে প্রায় এইরূপ হয়;—

"বালিকার হৃদয়ে এত প্রেম জানিতাম না,
জানিলে কখন এ ফুল ছিঁড়িতাম না।"

এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া স্বভাবতই মন অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইল ও তৎপরে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা এই শ্লোক

কে লিখিয়াছিল, কাহার জন্য লিখিয়াছিল ও কেন লিখিয়াছিল জানিতে পারিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহাই বলিব।

(২)

যে উদ্যান এক্ষণে ব্যাঘ্রাদির আবাসস্থল হইয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা ইন্দ্রের নন্দনকানন অপেক্ষাও সুন্দর ও মনোহর ছিল। যে "ফুয়ারা" এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিষাদে কাঁদিতেছে, ঐ "ফুয়ারা" একদিন গোলাপজল উদ্গীরণ করিত। যে অট্টালিকা এক্ষণে ভগ্নস্তূপ মাত্র, এক সময়ে ঐ অট্টালিকা বিলাসভূমির আকর ছিল। যেখানে এক্ষণে দিবসে শৃগাল রব করিতেছে, এক সময়ে সেইখানে অপ্সরীবিনিন্দিতা রমণীগণ সঙ্গীত ও বাদ্যে মন মাতাইয়া তুলিত।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আরঙ্গজিব আমেদনগরে বাস করিতেছেন, যখন এই উদ্যান বিলাস সাগরে ভাসিতেছে, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী মনোহর নিকুঞ্জ মধ্যে একটী যুবক একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। যুবকের বয়স অষ্টাদশের কিছু উপর; শরীরে যথেষ্ট বল আছে; বেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায়; কোমরে কেবল একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা। হিন্দুবীর কোন্ সাহসে আরঙ্গজিবের বেগম মহলে প্রবেশ করিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ পরে অলঙ্কারের মধুর শব্দ শ্রুত হইল, সহসা যেন চতুর্দ্দিক আলো করিয়া একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ধীরে ধীরে সেই নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক চমকিত হইয়া উঠিয়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে দূরে সারিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরী কহিলেন, "পুরন্দর,

আমি অস্পৃশ্য, আমাকে ছুঁইওনা।" পুরন্দর সে কথা না শুনিয়া যুবতীর গণ্ডে পাগলের ন্যায় শত সহস্র চুম্বন করিলেন, উভয়েরই গণ্ড বহিয়া অবিরত ধারে নয়নাশ্রু ঝরিতেছিল। পুরন্দর বলিলেন, "ফুল,—শরীর অপবীত্র হইয়াছে, কিন্তু হৃদয় তো হয় নাই! তোমার হৃদয় আমার; শরীর তো কখনও দেখি নাই, চাই নাই। আজ তোমারই অনুরোধে সে শরীর হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিতেও তো আসিয়াছি।" পুরন্দরের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া ফুল কাঁদিতেছিল, পুরন্দরও কাঁদিতে-ছিলেন। এইরূপে নীরবে দুইজনে কতক্ষণ কাঁদিলেন, তাহা দুইজনের কেহই জানিতে পারিলেন না। রমণীহৃদয় সকলে কোমল কহে, কিন্তু রমণীর ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু হৃদয়ও আর কাহারও নাই। ফুল প্রথম কথা কহিল, তখন আর তাঁহার চক্ষে জল নাই। ফুল বলিল "এ অপবিত্র দেহ রাখিব না স্থির করিয়াছি; যদি এ হৃদয় আমার হইত তাহা হইলে এতক্ষণ ইহাকে এ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম। কিন্তু পুরন্দর, যখন ছেলে মানুষ তখন হইতেই এ হৃদয় তোমার, এ শরীরও তোমার ছিল! কিন্তু বলে মহাপাতকী এ শরীরকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এ শরীর আর রাখিব না। তোমাকে ডাকিয়া বিপদে আনিয়াছি, আর বিলম্ব কেন, চল যাই।" পুরন্দর ধীরে ধীরে কটিবন্ধ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন, বলিলেন "মায়া দয়া সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি মরিয়া দুই জনে মিলিব। তবু যে—।" ফুল একটু বিষাদপূর্ণ-হৃদয় বিদারক হাসি হাসিয়া বলিল "ছি, তুমি আমাকে নরক যন্ত্রণা হইতে স্বর্গে লইয়া যাইতে ভাবিতেছ!" পুরন্দর ফুলকে

হৃদয়ে লইয়া অসংখ্য চুম্বন করিয়া বিকৃত স্বরে কহিলেন, "চল আর বিলম্ব কেন ?" ফুল হৃদয় পাতিয়া দিল, শাণিত ছুরিকা উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই ফুল অপেক্ষাও কোমল ফুলের হৃদয়ে ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা হইল না।

নিকুঞ্জ পার্শ্ব হইতে একজন মহা বলবান কৃষ্ণকায় খোজা এ ঘটনা দেখিতেছিল। যুবককে ছুরিকা তুলিতে দেখিয়া সে আসিয়া ক্ষিপ্র হস্তে যুবকের হস্ত ধরিল। উভয়ে চমকিত হইলেন। সহসা ফুলের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সিংহীর ন্যায় ফুল খোজার দিকে ফিরিলেন, বলিলেন "মসরুর, জান আমি কে ?" খোজা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "আপনি বেগম ফুল জানি।" ফুল বলিলেন "আমি আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই যুবকের হস্ত ত্যাগ কর ; ইনি আমার একজন আত্মীয়।" অবিচলিত ভাবে খোজা কহিল "বেগম সাহেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই কাফেরের হস্ত ত্যাগ করিলাম, কিন্তু যে বেগম সাহেবের প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছিল বাদসাহের হুকুম ভিন্ন তাহাকে ছাড়িতে পারি না।" "তবে পার বন্দীকর" এই বলিয়া ফুল দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সজোরে ভূমিতে পদাঘাত করিলেন, অমনি দেখিতে দেখিতে পুরন্দর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থান তাঁহার পদ নিম্নে নামিয়া গেল। তিনি হস্ত মুক্ত পাইয়া খোজাকে আক্রমণ করিতে যাইতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে পুরন্দর মৃত্তিকা নিম্নে অন্তর্ধান হইলেন, দেখিতে দেখিতে আবার যেরূপ স্থান সেইরূপ হইল। তখন ফুলজানি বেগম মন্দ গমনে কুঞ্জ হইতে সিংহীর ন্যায় বাহির হইলেন ;

বাহিরে আসিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন "যদি ইচ্ছা হয় এ সংবাদ বাদসাহকে দিও।"

খোজা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়াছিল। বলিল "সে সাধ আর বড় নাই।" "একটা বালিকা আমাকে ঠকাইল? স্বয়ং পেরগম্বর স্ত্রীলোকের নিকট ঠকিয়াছিলেন, আমি কোন ছার! যাহাহউক কাফেরকে ধরিতে হইবে।" এই ভাবিয়া খোজা মসরুর বংশী ধ্বনি করিল, অমনি আর দুই জন খোজা আসিয়া সেলাম করিল। মসরুর কহিল "তোমরা বোধ হয় জান এখান হইতে একটা শুড়ঙ্গ পথ আছে?" একজন খোজা কহিল 'আছে, বাদসাহের শয়ন-গৃহ হইতে নগর পর্য্যন্ত একটী পথ মাটীর নীচে দিয়া আছে।" মসরুর বলিল, "সত্বর যাও, এই শুড়ঙ্গ দিয়া একজন মাহাট্টা গিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে।" তাহারা দ্রুত পদে চলিয়া গেল। তখন মসরুরও ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

(৩)

ফুল ও পুরন্দরের কিছু পরিচয় দিব। আমেদাবাদের পাঁচ ক্রোশ দূরে দেবীগাওন নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লি ছিল, এক্ষণে ইহার কোন চিহ্নও নাই। এই পল্লিতে নারায়ণরাও নামে একজন মধ্যবিৎ লোক বাস করিতেন, পুরন্দর তাঁহারই একমাত্র সন্তান। ঐ গ্রামে একটী দুঃখিনী বিধবা রমণী বাস করিত, ফুলবাই তাঁহা-রই কন্যা। লোকে বলিত এই দুঃখিনী বিধবা কোন রাজপুত রাজার মহিষী। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, বোধ হয় ফুলের অলোকসামান্য রূপ ও রাজরাজেশ্বরী ভাব দেখিয়াই লোকে এ জনরব রটাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে ফুল ও পুরন্দর এক সঙ্গে

থাকিত, কারণ পুরন্দরদিগের বাটীর পার্শ্বেই ফুলের মাতা বাস করিতেন। যখন ফুল প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষে পড়িল, তখন পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে ফুলের সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের দুই দিন পরে ফুলের মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল। সুতরাং প্রেমময় দুইটী হৃদয় মিলিয়াও বিমল সুখে থাকিতে পারিল না। কিন্তু যে দুইটী হৃদয় যেন পরস্পরের জন্যই জন্মিয়াছিল ও যাহা এই কয়দিন মাত্র একত্রিত হইয়াছে, হায়! সেই দুইটী হৃদয় আবার বিচ্ছিন্ন হইল। বিবাহের ঠিক এক মাস পরে একদিন আরঙ্গজিব বাদসাহ শিকারে আসিয়া দেবীগাওনে ফুলকে দেখিলেন তৎক্ষণাৎ হুকুম জাহির হইল। শিবজী ভিন্ন তখন ভারতবর্ষে এমন কেহ লোক ছিল না যে বাদসাহের হুকুম অমান্য করে, সুতরাং ফুল অবাধে বেগম মহলে প্রেরিত হইলেন। সেখানে "ফুলজানি বেগম" নামে অভিহিতা হইয়া মনোহর বিলাসপূর্ণ হর্ম্ম্যে ফুল বাস করিতে লাগিলেন। ফুল ও পুরন্দরের মনের ভাব আমি বর্ণনা করিতে যাইব না, পুরন্দরের পিতা মাতার ক্রন্দন ও লিখিব না, সমস্ত গ্রামবাসীর দুঃখও বর্ণন করিব না।

ফুল এক মাস মতিবাগ নামক উদ্যানে বাস করিলেন। সেই শত্রুপুরেও তিনি একটী সখী পাইয়াছিলেন। এই রমণী একজন বাঁদি, সকলে ইহাকে "জুমেল" বলিয়া ডাকিত। ফুল জুমেলের সহায্যে পুরন্দরকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্রে তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া তৎপরে সেইখানে আসিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে তবে আইস দুইজনে এক সঙ্গে মরি; মরিলে আর এ পাপ পৃথিবীতে

থাকিতে হইবে না, স্বর্গে গিয়া দুই জনে সুখে থাকিব। এ নরক হইতে উদ্ধারের যখন অন্য উপায় নাই তখন আইস, তোমার শাণিত ছুরিকা আমার হৃদয়ে বসাইয়া আমায় মারিয়া ফেলিয়া বাঁচাও।" পুরন্দর তেজস্বী মার্হাট্টা। নিজ স্ত্রীকে পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার প্রাণ নষ্ট করা ভাল বিবেচনা করিয়া ফুলের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। জুমেলৈর বুদ্ধি কৌশলে অজ্ঞাতসারে তিনি বেগম মহলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

(৪)

সহসা মৃত্তিকানিম্নে অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত হইয়া পুরন্দর স্তম্ভিত হইলেন। এত শীঘ্র গতিতে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ব্যাপার কি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকক্ষণ ভাবিতেও হইল না, একটী কোমল হস্ত তাঁহার পৃষ্ঠস্পর্শ করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ?" যেন স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল "যুবক সত্বর পলায়ন কর, নিকটে শত্রু আছে। বেগম ফুলের একান্ত অনুরোধ সত্বর পলাও। অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যদি বাঁচিতে পার ফুলের সহিত দেখা হইবে। পালাও, সুড়ঙ্গ মুখে সুসজ্জিত অশ্ব দেখিবে।" স্বর ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়া গেল; তখন পুরন্দর অন্য উপায় নাই দেখিয়া পলায়নই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সুড়ঙ্গ মুখে আসিতে অনেক বিলম্ব হইল; কিন্তু বাহির

হইয়া দেখিলেন একটী অশ্ব সত্য সত্যই দাঁড়াইয়া আছে। লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণ করিয়া অশ্ব ছুটাইলেন।

কিছুদূর যাইয়া তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাকে দুই জন অশ্বারোহী অনুসরণ করিতেছে। অশ্বকে আরও বেগে ছুটাইলেন, কিন্তু তিনি যেমন একটী পথ ফিরিবেন অমনি প্রবল বেগে দুইটী তীর আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল। তিনি সে দুঃসহ যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে পুনঃ পুনঃ পদতাড়না করিতে লাগিলেন। তত্রাচ দেখিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছে। তখন তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া অশ্বকে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল, তিনি অন্ধকারে এক গৃহপার্শ্বে লুকাইলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় আসিয়া পড়িল সম্মুখস্থ অশ্বে যুবক আছেন ভাবিয়া তাহারা সেই অশ্বের অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে অশ্বের পদ শব্দ বাতাসে মিশিয়া গেল।

যখন চতুর্দ্দিক নীরব হইল তখন যুবক বাহির হইলেন। এ কোথায় আসিয়াছেন, কত রাত্রি হইয়াছে, ইহার কিছুই তাঁহার দেখিবার এতক্ষণ সময় হয় নাই। এখন দেখিলেন আমেদাবাদের একটী জনশূন্য স্থানে তিনি আসিয়াছেন, রাত্রি প্রায় নয়টা হইয়াছে। যুবক তখন সবলে বাহু হইতে তীরদ্বয় তুলিলেন। তীরের সহিত তীরবেগে রক্ত ছুটিল। নিজ উষ্ণীষবস্ত্র দিয়া বাহু বদ্ধ করিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে রক্ত তাঁহার সমস্ত বস্ত্রাদি ভিজাইল। পুরন্দর তখন গৃহে যাইবার মনন করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। রক্ত-

পাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি কষ্টে পড়িতে পড়িতে একটী পথ পার্শ্বস্থ গৃহসোপানে বসিলেন। বসিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

(৫)

যখন পুরন্দর সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এক সুবৃহৎ গৃহে তিনি হস্ত পদ দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ পড়িয়া আছেন। গৃহে শত শত স্বর্ণদীপে সুগন্ধি তৈল পুড়িতেছে ও সেই গন্ধে গৃহ মাতাইয়া তুলিয়াছে। পুষ্পহার প্রতি স্তম্ভে জড়িত, পুষ্প নির্ম্মিত সুবৃহৎ পাখা উপরে দুলিতেছে। সম্মুখে স্বর্ণসিংহাসনের উপর দিল্লিশ্বর, পার্শ্বে তাঁহারই ফুল। তিনি বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। বাদসাহের সম্মুখে দ্বাদশ জন মনোমোহিনী সঙ্গীত ও নৃত্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার ক্ষত হইতে আবার প্রবল বেগে শোণিত নির্গত হইল, তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

পুনরায় যখন তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল তখন তিনি দেখিলেন যে, তিনি বাদসাহের সিংহাসনের নিকট আনীত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চারিজন খোজা শাণিত ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান আছে, গীত বাদ্য বন্ধ হইয়াছে; রমণীগণ সারি দিয়া বাদসাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার বিচার উপস্থিত। তখন এরূপ অপরাধের বিচার এইরূপ দরবারে, এইরূপ ভাবেই হইত। যুবকের সরলতাপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া কঠোর প্রাণ আরঙ্গজিবের হৃদয়ও একটু নরম হইয়াছিল, নতুবা এতক্ষণ তাঁহাকে যমপুরে বাস করিতে হইত। আরঙ্গজিব

কহিলেন, "যুবক, তোমার অতিশয় সাহস ; যে বেগম মহলে পক্ষী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলে। যদি তুমি কাহার নিকট আসিয়াছিলে বল তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।" যুবার পক্ষে তাহা বলা অসম্ভব। তিনি সে দিন মরিতেই আসিয়াছিলেন, সুতরাং মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না ; এবং ইহাও বেশ জানিতেন যে, তিনি মরিলে ফুলও মরিবে, আর এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল যে, মরিলে তাঁহারা দুই জনে স্বর্গে মিলিবেন। এই সকল কারণে পুরন্দর কহিলেন "বাদসাহ, অপরাধ করিয়াছি, প্রাণ দণ্ড হইবে, প্রাণদণ্ড করুন ; কিন্তু কিছুতেই কাহার নিকট আসিয়াছিলাম বলিব না।" বাদসাহের সম্মুখে এরূপ কথা কেহ কখন বলিতে সাহস করে নাই। আরঙ্গজিবের মুখ লোহিত বর্ণ হইল। তিনি ক্রোধে কম্পিত হইতেছিলেন। খোজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন "এখনি এই পামরের প্রাণ নাশ কর। এ মহলে যে যে বাস করে সকলেই এখানে দাঁড়াইয়া আছে। কোন্ বাঁদির প্রণয়ার্থে এ যুবক এখানে আসিয়াছিল?" কেহই উত্তর করিল না। তখন আরঙ্গজিব আরও রাগত হইয়া উঠিলেন। রাগ হইলে আরঙ্গজিবের জ্ঞান থাকিত না। আজ্ঞা করিলেন "এখানেই এই পামরকে নাশ কর, তাহার প্রণয়িনী দেখিয়া সুখী হউক।" আজ্ঞা মাত্র চারিখানি শাণিত ছুরিকা উঠিল, বিদ্যুতের মত চকিল, তৎপরে একটী হৃদয় বিদারক চীৎকারে গৃহ, উদ্যান ও আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল। বাদসাহ স্বয়ং অসি হস্তে সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে নামিলেন। নামিয়া যাহা দেখিলেন, সে অতি লোমহর্ষণ, হৃদয় বিদারক

দৃশ্য। দেখিলেন ফুলজানি বেগম স্বয়ং গিয়া সেই শাণিত ছুরিকার সম্মুখে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছেন। দুইখানি ছুরি তাঁহার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও পুরন্দর বাঁচে নাই, আর দুই খানি পুরন্দরের হৃদয়েও বিদ্ধ হইয়াছে। বাদসাহ যথার্থ ফুলকে একটু ভাল বাসিতেন, দুঃখে কহিলেন, "ফুল করিলে কি?" ফুলের জীবন পৃথিবীতে অধিকক্ষণ আর রহিবে না। ফুল বাদসাহের দিকে চাহিয়া কহিলেন "দাসীকে ক্ষমা করিবেন; স্বামীকে বুক দিয়া স্ত্রীলোকের রক্ষা করা উচিত, তাহাই করিয়াছি।" এই কয়টী কথা মুমূর্ষ পুরন্দরের কর্ণে গেল। তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইয়াছিল, তত্রাচ এই কয়েকটী কথায় যেন তাঁহার শরীরে বল আসিল, তিনি ফুলের মস্তক মুখের নিকট লইয়া গণ্ডে চুম্বন করিলেন, ফুল প্রত্যাবর্ত্তন করিল। উভয়ের চক্ষু মুদিত হইল; আর এ পৃথিবীতে খুলিল না। যাও ফুল যাও, প্রেমের যদি মাহাত্ম থাকে তবে তুমি চির-সুখে স্বামীসঙ্গে বৈকুণ্ঠে বাস করিবে।

(৬)

বাদসাহের পাষাণ প্রাণও এ দৃশ্যে দ্রবীভূত হইল। আজ্ঞা করিলেন, "সাত দিবস আমেদাবাদ নগরের সকল লোকে শোক-চিহ্ন ধারণ করুক। এই প্রাসাদের সম্মুখে ইহাদের দুই জনকে একত্রে কবর দাও। ঐ কবরের উপর অদাই শ্বেত প্রস্তরের এক ফুয়ারা নির্ম্মাণ কর। ঐ ফুয়ারা যেন দিবারাত্রি গোলাপ জল বর্ষণ করে, আর ঐ কবরের নিম্নে ইহাদের স্বর্গীয় প্রণয়ের স্মরণ লিপি স্বরূপ একটী শ্লোক লিখাও।" দিল্লিশ্বরের আজ্ঞায় এক দিবসে নগর হইয়াছে, এ সামান্য কার্য্য হইবে

আশ্চর্য্য কি? পর দিবস সন্ধ্যাকালে ফুল ও পুরন্দরের কবরের উপরস্থ ফুয়ারা গোলাপ জল বর্ষণ করিতেছে; বাদসাহ আসিয়া স্বয়ং একটী গোলাপ বৃক্ষ কবরের উপর রোপণ করিলেন। প্রায় তিন শত বেগম ও তাহাদের প্রায় দেড় সহস্র বাঁদি ও সহচরী সেই সময়ে এক একটী পুষ্প হার সেই কবরের উপর স্থাপন করিলেন। তখন বাদসাহ বলিলেন "শ্লোক পাঠ কর, কে রচনা করিয়াছে?" তখন একজন কহিল "জাহেন, জাহেন, ফুলজানি বেগমের বাঁদি জুমেল ইহা লিখিয়াছে।" বাদসাহ জুমেলকে পাঠ, করিতে আজ্ঞা করিলেন, জুমেল পড়িল;—

"বালিকার হৃদয়ে এত প্রেম জানিতাম না,
জানিলে কখন এ ফুল ছিঁড়িতাম না।"

কনকলতা।

(১)

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে গয়ার নিকট বৌদ্ধদিগের অনেক গুলি ভগ্নাবশেষ মঠ এখনও বিদ্যমান আছে। কয়েক বৎসর হইল আমি এই সকল মঠের ভিতর এক দিবস ভ্রমণ করিতেছিলাম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতেছিলাম। চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটী ভগ্নাবশেষ মঠের একখানি প্রস্তরের উপর অঙ্কিত দুইটী চিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। চিত্র দুইটী সামান্য, ও একটীর পার্শ্বে আর একটী স্থাপিত, বোধ হয় কোন সামান্য অস্ত্র দ্বারাই

ইহা প্রস্তরের উপর অঙ্কিত হইয়াছিল। একটীতে একজন সন্ন্যাসিনী ধ্যানে মগ্না, সম্মুখে এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও এক দৃষ্টে সন্ন্যাসিনীর দিকে চাহিয়া আছেন। দ্বিতীয় চিত্রে সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসী আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছেন। একজন সন্ন্যাসিনীকে একজন সন্ন্যাসী এরূপ করিতেছেন, সেই চিত্র আবার অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমার মনে স্বতঃই উদয় হইল যে এ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসী নহেন; ইঁহাদের নিশ্চয়ই এক ইতিহাস আছে। এই কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম এবং অনেক পরিশ্রমে ও অনেক দিবস পরে যাহা অবগত হইয়াছিলাম তাহাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জানিলাম, যিনি এই চিত্র দুইটী অঙ্কিত করিয়াছিলেন তিনি একজন সন্ন্যাসী, এখনও জীবিত আছেন। প্রথম এই মাত্র সন্ধান পাইলাম; পরে জানিলাম তাঁহার নাম সদানন্দ যোগী; এক্ষণে বোধ হয় কাশীধামে আছেন। আমিও কাশী যাইতেছিলাম। কাশী যাইয়া শুনিলাম তিনি কালিঘাট গিয়াছেন; সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া কালিঘাটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলাম ও এই চিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই এক্ষণে আমি লিখিতেছি।

(২)

*কলিকাতার ৬। ৭ ক্রোশ দূরে গৌরীপুর নামক একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হরিহর চট্টোপাধ্যায়

*এই গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম কাল্পনিক করিতে হইয়াছে। ঘটনাটী আধুনিক, এই ঘটনা সম্বন্ধীয় লোক এখনও অনেক জীবিত আছেন।

নামক একজন গরিব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের "কনক-লতা" নাম্নী একটী কন্যাই সংসারের এক মাত্র সম্বল। এক দিবস কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র, কনকভূষণ কোন কার্য্যবশতঃ বারাসত যাইতে গৌরীপুরে কনকলতাকে দেখিয়া যান। কনকলতার দরিদ্রতা ও সরলতা দেখিয়া বনের পশু-পর্য্যন্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইত, কনকভূষণের ন্যায় শিক্ষিত যুবকের মন যে মোহিত ও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে আশ্চর্য্য কি ?

কনকভূষণের পিতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি কেন গরিবের কন্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন ? কনকভূষণের বিবা-হের অনেক সম্বন্ধ হইল ; কনকভূষণ তাহার সকল গুলিই গোল করিয়া দিলেন। হঠাৎ কনকভূষণের পিতার মৃত্যু হইল, মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদির পর কনকভূষণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন তিনি বালিকা কনকলতাকে এক দিন-মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তাহাকে ভুলেন নাই। তিনি অন্যান্য কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া একদিন গৌরীপুর চলিলেন।

যখন কনকভূষণ কনকলতাকে প্রথম দেখিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র ছিল, এক্ষণে কনকলতার বয়স প্রায় চতুর্দশ বৎসর। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যাকে সহজে কে বিবাহ করিতে চাহে ? সুতরাং চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কনকের তখন ও বিবাহ হয় নাই। কনকভূষণ গৌরীপুর গিয়া এই সকল সংবাদ জানিলেন ও পরে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রির জন্য তাহার আলয়ে অতিথি হইতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ গরিব বটে কিন্তু তাঁহার ন্যায় দেবগুণসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্মে।

পিতার গুণেই কনকলতা রূপে গুণে দেবীতুল্যা হইয়াছিল। বৃদ্ধ অতিথিকে মহা যত্ন সহকারে আহারাদি করাইলেন। বলা বাহুল্য যে কনকলতাও তাহার যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিল। আহারাদির পর কনকভূষণ ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, কথায় কথায় কন্যার বিবাহের কথা তুলিলেন, অবশেষে নিজ পরিচয় দিয়া একেবারে তাঁহার সহিত কনকলতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণের মহা আনন্দ। তার পর দিন কনকলতার "গায় হলুদ" হইল। তার পর বিবাহ হইল, তার পর খাওয়া দাওয়া ধূম ধাম নাচ গাওনা অনেক হইল। কনকভূষণ যে দয়া করিয়া, অনেকের নিকট অনেক কথা শুনিয়াও কনকলতাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতেই কনকলতা তাঁহাকে খুব ভাল বাসিল।

(৩)

বিবাহের তিন বৎসর পরে কনকলতা একবার গৌরীপুর দেখিতে চাহিল কনকভূষণ যদিও ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র কুটীর অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কখনও সেখানে যাইতে দিতেন না। তিনি শ্বশুরের জন্য কলিকাতায় বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ সেই স্থানেই থাকিতেন। কনকলতা সেই বাল্য আবাস ভূমি ক্ষুদ্র কুটীর একবার দেখিতে চাহিল কনকভূষণ কখনই কনকলতার ইচ্ছা অপরিতৃপ্ত রাখিবেন না, তাঁহার মনে মনে এইরূপই ছিল; সুতরাং লোকজন সঙ্গে দিয়া কনকলতাকে পাঠাইলেন, কনকলতা সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে; আর

তাঁহার নিজের কোন বিশেষ কার্য্য থাকায় তিনি সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কনক গৌরীপুর চলিল।

সন্ধ্যার সময় কনকভূষণ যাহা শুনিলেন তাহাতে আর তাঁহার সংজ্ঞা থাকিল না। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি শুনিলেন যে, কনকলতা যে গাড়ীতে যাইতে ছিলেন সে গাড়ী যখন গৌরীপুর যাইয়া পৌছিল, তখন তাহার ভিতরে কনকলতা নাই। কনকলতা কোথায় গেল কেহই বলিতে পারে না, গাড়ী পথে কোন খানেই থামে নাই। সকলেই এই আশ্চর্য্য রূপ অন্তর্ধান দেখিয়া ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কনকলতার অনেক অনুসন্ধান হইল, কোথাও তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সকলেই শেষে বলিতে লাগিল, "কনকলতার মাতা আসিয়া কনকলতাকে লইয়া গিয়াছে।" কনকের মাতার মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা বশতঃ তাঁহার উপযুক্ত সৎকার না হওয়ায় সকলেই বলিত কনকের মাতা "প্রেতযোনি" পাইয়াছে। এক্ষণে কনকের এইরূপ আশ্চর্য্য অন্তর্দ্ধান দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল কনককে নিশ্চয় সেই "ভূতে" লইয়া গিয়াছে। সে কথা কনকভূষণ বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু তিনি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা দিল; ক্রমে ক্রমে সকলেই দেখিল যে কনকভূষণ সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে কেবল এক কথা—"ঐ কনক আমার আসচে।"

এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে কনকভূষণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার উন্মত্ততা গেল, কিন্তু কনকলতা তাঁহার হৃদয় হইতে যায় নাই। কত কত বিবাহের সম্বন্ধ আসিল, কনকভূষণ তাহার নিকট

দিয়াও গেলেন না। তিনি ক্রমে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সকল বিক্রয় করিয়া টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বসত বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন। তৎপরে একদিন সকল আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী দিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার জগতে থাকিবার আর কিছুই নাই, যে গিয়াছে তাহারই নামে আজ আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম। তাহাকে পাই আবার সংসারী হইব, না পাই এই পর্য্যন্ত। আমি 'উইল' করিয়াছি। তোমাদের সকলকেই আমি কিছু কিছু দিয়াছি, গ্রহণ করিলে বুঝিব যে যথার্থই তোমরা আমাকে ভাল বাস।" কনকভূষণ উইলে সকলকেই যথেষ্ট দান করিয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রে কনকভূষণ সন্ন্যাসী বেশে বাটীর বাহির হইলেন। কোথায় গেলেন কেহ জানিল না। সকলেই এই ঘটনায় বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

কনকভূষণ গৌরাপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থানে প্রায় তিন মাস থাকিয়া কনকের সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই পাইলেন না। তখন ভাবিলেন কনক বোধ হয় মরিয়াছে, কিন্তু যদি কনক মরিয়াই থাকে তবে তাহার মৃত দেহ কোথায় গেল? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া কনকভূষণ কাশী যাত্রা করিলেন, তথায় একজন মহা যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কনকভূষণ তাঁহাকে কনকের অন্তর্দ্ধান ব্যাপার সকল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগী কহিলেন, "যোগ শিক্ষা কর, জানিতে পারিবে।" কনকের সংবাদ জানিতে পারিবেন এই ভাবিয়া কনকভূষণ যোগ শিখিতে মনস্থ করিলেন ও পর দিবসই সেই যোগীর শিষ্য হইয়া মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে

তিনি গুরুর সহিত কাশী ত্যাগ করিলেন। সেই দিবস হইতে পাঁচ বৎসর কনকভূষণের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

(৪)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জন সন্ন্যাসী কানপুরের দিকে অতি দ্রুতপদে আসিতেছিলেন। সকলেই অবগত আছেন যে, সেই সময় ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সিপাহিবিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ইংরাজ রাজ্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমি যে দিনের কথা বলিতেছি সেই দিন নানা সাহেব সসৈন্যে কানপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। দুইজন সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আসিয়া কানপুরে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তাহার মধ্যে একজন কনকভূষণ, অপর জন তাঁহার গুরু। এখন কনকভূষণ আর সে কনকভূষণ নাই. এখন তাঁহাকে কনকভূষণ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না, কনকভূষণ এখন আর কনকভূষণ নামেও অভিহিত নহেন, এখন তাঁহার নাম পরমানন্দস্বামী। কানপুরে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দকে গুরু কহিলেন, "এক্ষণে যাও, স্বকার্য্য সাধন কর। অদ্যই তাঁহাকে মন্ত্রে দীক্ষিত কর, অদ্যই তাঁহাকে হিমালয়ে গমন করিতে অনুজ্ঞা কর।" কনকভূষণ কহিলেন 'গুরুদেব! এ কার্য্য আপনার দ্বারাওতো হইত।" গুরু কহিলেন, "হইত না, অদ্য তোমাকে তাহার কারণ বলিয়া দি, শ্রবণ কর। সেই সকল গূঢ় তত্ত্ব জানিলে কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে সুবিধা হইবে। যাঁহারা সাধনার বলে পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন দেশ বিশেষের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হয়েন না।

তাঁহাদের সুখ দুঃখ নাই, তাঁহারা সদা আনন্দসাগরে মগ্ন। এই জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইয়াছেন তাঁহারাই সুখ দুঃখ বোধ করেন। এই জন্য যাঁহারা আমাদের মত যোগী তাঁহারা এই ভারতবর্ষের অনন্ত দুঃখ দেখিয়া কখন কখন ক্লেশ অনুভব করেন, কিন্তু কেহই নিজ নিজ সাধনা ত্যাগ করিয়া এ কার্য্য করিতে চাহেন না। আমিই কেবল এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হই, কিন্তু এই কার্য্য সাধন জন্য যে সকল কার্য্য করা উচিত তাহা আমার দ্বারা সম্ভব নহে, আবার কোন সংসারীর দ্বারা ও সম্ভব নহে, এই জন্য একজন যোগীর আবশ্যক, যে ভিন্ন উদ্দেশ্যে যোগ করিতেছে। যে যোগ করিতেছে কিন্তু প্রাণ রহিয়াছে কোন গৃহীর প্রতি। তাহা হইলে যোগ বলে তাহার ক্ষমতা হইবে, আর সেই ক্ষমতা সে চালনা করিতেও প্রস্তুত থাকিবে। এইরূপ যোগী হইবার জন্য, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত একটী শিষ্যের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিলাম, কোন স্থানেই পাইলাম না, অবশেষে কলিকাতায় গিয়া তোমায় দেখিলাম, যোগবলে তোমার নিকট হইতে কনকলতাকে বিচ্ছিন্ন করিলাম, তোমাকে যোগ শিক্ষা দিলাম। অদ্য যে ইংরাজ রাজ্য যায় যায় হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা তোমার সাধ্য। ইংরাজরাজ্য ভারতে বিস্তৃত না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। তাহাই তোমাকে বলিতেছি এখনই যাইয়া নানা সাহেবকে নিবৃত্তি কর"। পরমানন্দস্বামী নানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া হিমালয়ে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। নানা সাহেব একটী প্রার্থনা করিলেন,

বলিলেন, "প্রতিহিংসা বৃত্তি নিবৃত্তি করিব, নতুবা যোগাদি কিছুই আমার দ্বারা হইবে না।" তাহাই তৎপর দিবস সমস্ত ইংরাজ আবাল বৃদ্ধ বনিতা কানপুরে হত্যা হইয়াছিল।

পর দিবস সকলেই অবগত হইল, নানা সাহেব পলাইয়াছেন; মস্তক শূন্য হইয়া বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ইংরেজ পতাকা ভারতে আরও দৃঢ়তর হইয়া প্রোথিত হইল কিন্তু কে জানিল যে একটী বাঙ্গালীর দ্বারা এ কার্য্য সাধন হইল? পরমানন্দস্বামী গুরুর সহিত নগর প্রান্তে সাক্ষাৎ করিলেন। গুরু বলিলেন, "যাও, তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। কনকলতা যেখানে আছে তাহাতো জানই, যাও আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক।" কনকভূষণ গুরুদেবের পদ ধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

(৭)

এখন কনকলতার কথা বলিব। কনক গাড়ীতে যাইতে যাইতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সে দেখিল যে সে আর গাড়ীতে নাই, এক কুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহার মস্তকের নিকট এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন।* তাহার প্রথমে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে এ স্বপ্ন নহে। তখন সে সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিল, সন্ন্যাসী অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন "তোমার স্বামীর

* এই যোগের কার্য্য কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ঘটনা কিন্তু সত্য।

জন্য ভাবিও না, যদি স্বামীভক্তি রাখিতে পার তবে অদ্য হইতে দশ বৎসর পরে স্বামী সাক্ষাৎ হইবে।" সে কোথায় আসিয়াছে, কিরূপে আসিল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া জটাজুট পরিধান করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল। সন্ন্যাসী তাহাকে কোন মন্ত্র শিক্ষা দিলেন না; বলিলেন, "স্ত্রীলোকের মন্ত্র স্বামীভক্তি, স্ত্রীলোকের পূজার দ্রব্য স্বামী, সুতরাং তুমি স্বামী ধ্যান কর।" অন্য কোন ধ্যানে তাহাকে নিযুক্ত করিলে কনক তাহা পারিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং কনক সন্ন্যাসিনী হইয়া সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দিন রাত তাঁহারই সেবা করিতে লাগিল, পিতার জন্য সে প্রতিদিন কাঁদিত এবং স্বামীর জন্য সে অহোরাত্র কায়-মনোবাক্যে ধ্যান করিত। যে সন্ন্যাসীর নিকট কনকলতা রহিল তিনি কনকভূষণের গুরু নহেন, তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধু মাত্র। যে আশ্রমে কনক রহিল, সে আশ্রম বঙ্গদেশ নহে; গয়ার নিকট ইহা গিরির উচ্চ শিখরে স্থাপিত। যিনি এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন যাঁহার অঙ্কিত ছবি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই এই সন্ন্যাসী। এই আশ্রমে এইরূপে যোগে কনক দশবৎসর কাটাইল।

(৬)

দশবৎসর কনকলতা অনন্যমনে স্বামীধ্যান করিল; দশবৎসর যে দিন পূর্ণ হইবে সে দিনও কনক চক্ষু মুদিত করিয়া স্বামী ধ্যান করিতেছিল। সে সময় প্রায় সন্ধ্যা হয়, আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষশাখায় অসংখ্য পাখী সুললিত সঙ্গীত করিতেছে, সূর্য্যের সুবর্ণ বিভায় চতুর্দ্দিক সুবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, কনকের

কাহারও প্রতিই দৃষ্টি নাই, আশ্রমের বহির্ভাগে একটী বকুল বৃক্ষতলে যোগাসনে কনক ধ্যানে মগ্ন। বহুক্ষণ পরে কনক বলিল, "স্বামিন্! আর কতদিন তোমার দেখা পাইব না?" "কনক, আমি আসিয়াছি।" কনকের সম্মুখে দণ্ডায়মান এক জন সন্ন্যাসী এই কথা বলিলেন। কনক চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিল, পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিল—পরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল—দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন "কনক, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি কনকভূষণ।" তখন কনকলতার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল,—কনক এ মিলনানন্দ সহ্য করিতে পারিল না—চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। ভূমে পড়িতেছিল—কনক যাইয়া সেই অবশ দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কনকলতা প্রকৃতিস্থ হইলেন, কনকভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেশ কেন?" কনকভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ বেশ কেন?" কনকলতা কহিলেন, "তোমার জন্য।" কনকভূষণ কহিলেন, "আমারও তোমার জন্য।" তাহার পর কত কত কথা হইল; কনকলতা, কনকভূষণের নিকট যোগী সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিলেন, দুই জনে সেই বকুলতলায় বসিয়া দশ বৎসরের মনের কথা বলিতে লাগিলেন। আশ্রমের সন্ন্যাসী এই সকল ব্যাপার দূরে থাকিয়া দেখিলেন ও যে প্রস্তরের উপর তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন সেই প্রস্তরের উপর এই দম্পতীর মিলন দৃশ্য অঙ্কিত করিলেন, এখনও ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(৭)

তাহার পর কি হইল তাহা কি বলিতে হইবে? কনকভূষণ কনককে পাইলেন। তাঁহারা উভয়ে কলিকাতায় ফিরিলেন, আবার কনকভূষণ বাড়ী কিনিলেন, সংসারে মাতিলেন। তাঁহাদিগের একটী কন্যা হইল। এরূপ যোগী ও যোগিনী সুখে ছিলেন কি দুঃখে ছিলেন তাহা পাঠক বিবেচনা করুন?

তাঁহারা অধিক দিন সেই সুখভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কনকলতার জ্বর বিকারে মৃত্যু হইল; মৃত্যুর সাত দিবস পরে কনকভূষণ স্ত্রীর অনুগামী হইলেন। এক মাস পরে কনকভূষণের গুরু যোগী আসিয়া কনকভূষণের কন্যাকে লইয়া কাশী গেলেন,—তৎপরে আর কেহ তাঁহাদিগের কোন অনুসন্ধান পাইল না। কনকলতার কন্যার সন্ধান না হওয়ায় কনকভূষণের ঐশ্বর্য্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে গেল।

অভয়া বৈষ্ণবী।

(১)

বৃন্দাবনের নিকটস্থ প্রদেশবাসিনী রমণীগণের মধ্যে যে সকল সঙ্গীত প্রায় গীত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গীতটী বড়ই প্রচলিত;—

"সার ভেরি বেঁখলি কানুকা রাঙ্গা পাও,
কুচ নেহি, কুচ নেহি, সব এই ফাঁকিরে;
ছোড়, ছোড়, বাসনা,—ষব্ কানাকে চাও,
শুন সব কই, অভয়া বৈষ্ণবী বোলেরে।"

আরও অনেক সঙ্গীতে অভয়া বৈষ্ণবীর নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ও নানা স্থলে অভয়া বৈষ্ণবী "ধুয়া" সম্বলিত অনেক গান বৈষ্ণব দিগের দ্বারা গীত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এক সময়ে শান্তিপুরে জনৈকা অন্ধ বৈষ্ণবীকে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত গাইতে শুনিয়াছিলাম;—

"আমি, তোমার ভাবতো বুঝ্‌লেম না,
তুমি, কারেও হাসাও, কারেও কাঁদাও,
তুমি কারেও দেওগো ভিক্ষার ঝুলি।
আমি, তোমারই তরে, বেড়াইগো ঘুরে,
আমি হৃদয় খুলে গো কাহারে বলি।
তুমি দেখা দিয়ে ওতো দেখা দেওনা,
আমি তোমার ভাবতো বুঝলেম না।
কালার এইতো লীলা,
কালা ধরায় আমার এমনি খেলে;
তোমারে ভজ্‌রে কালা,
ওরে অভয়া বৈষ্ণবী এ কথা বলে।"

যাহার গান গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ হইতে যমুনা কূলবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত নানা স্থানে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়, সে এক জন কম লোক নহে। নিম্নে এই বৈষ্ণবী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি লিখিতেছি।

(২)

প্রায় চারি শতাব্দী গত হইল এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবদ্বীপের বাজারে কয়েক জন লোক দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিল, একজন বলিল, "বেটারা পাগল হয়েছে।" আর একজন

কহিল, "কি বাজনাই বার করেছে, মরে যাই আর কি ;—ব্যাটা-দের জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার জো নাই।" আর একজন বলিল, "হরিনাম ঢের শুনা গেছে।" আর একজন বলিল "ছোঁড়াটা এত লেখা পড়া শিখে শেষ পাগল হ'ল।" আর একজন বলিল, "দেখে শুনেই তো আমার ছেলেটাকে পাঠশালায় দিই নি।" এই সময় দূরে খোল, করতাল ইত্যাদির বাদ্য শ্রুত হইল। একজন বলিল "আর শুনেছ,—আজ একটা মাগী ব্যাটাদের সঙ্গে মিসে ছিল ?" অপরজন বলিল "সে যে এই বাজারের হবে মুদির মেয়ে, আর বৎসর বিধবা হয়েছে। ছুঁড়ির বৈষ্ণব ভায়াদের মজাবার ইচ্ছা আছে।" একজন বলিল "সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলে যে নিতাই বাবাজির সঙ্গে ওর অনেক দিন থেকে একটু গোলমাল আছে। বৈষ্ণবের দলে না মিস'লে তো আর—।" একজন প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "ভায়া, ছি,—নিমাইয়ের নামে ও কথা বলিলে মহাপাপ হয়।" জনতার মধ্য হইতে কয়েক জন বলিয়া উঠিল "ঢের দেখা গেছে।" এই সময়ে নিতাই স্বদলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাজারে প্রবেশ করিলেন। যে খোল করতাল ও সঙ্কীর্ত্তনে আজ সমস্ত জগতবাসী মাতিয়া উঠিয়াছে,—যাঁহার নাম আজ পৃথিবীময় পূজিত হইতেছে,—সেই সংকীর্ত্তন ও সেই শ্রীচৈতন্যকে নব-দ্বীপের বাজারে—

"মাত্‌রে, মাত্‌রে, হরিনামে মাত্‌রে,
প্রেম সাগরে প্রেম সাগরে ভাস্‌রে"

বলিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া [illegible]বাসীগণ বিদ্রূপাদি করিতে লাগিল। নিমাইয়ের [illegible] ভ্রূকপাত নাই,—তিনি

বাহু তুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও বলিতেছেন, “মাত্‌রে মাত্‌রে, হরি নামে মাত্‌রে।”

এই সময়ে বাজারের পশ্চিম দিকস্থ একটী দোকান হইতে একটী ষোড়ষ বর্ষীয়া যুবতী,—আলুলায়িতা কেশা, গেরুয়া বসন পরিধানা,—বেগে বহির্গত হইল। দুই জন লোক আসিয়া তাহাকে ধরিল, কিন্তু যুবতী সবলে আপনাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া “মাত্‌রে, একবার মাত্‌রে” বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সঙ্কীর্ত্তনের দলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তৎপরে চারিদিকে একটা ভয়ানক গোল উঠিল,—চারিদিক হইতে লোক ছুটিল। সেই গোলযোগের মধ্যে বৈষ্ণবগণ একেবারে হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

(৩)

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে মালদহের নিবিড় অরণ্য মধ্যে একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নালোকে এক পক্ব শশ্রু জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সম্মুখস্থ উপবিষ্টা ধ্যানে মগ্না এক রমণীর প্রতি সস্নেহে চাহিতেছিলেন। রমণী বোধ হয় বহু দিবসাবধি এই রূপ অবস্থায় বসিয়া আছেন, কারণ তাঁহার আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশ চারিদিকে ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—সেই চুল বাহিয়া কয়েকটী লতা রমণীর মস্তক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। যোগাসনে রমণী ধ্যানে মগ্না, হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপিত,—চক্ষু মুদিত। যোগী সস্নেহ নয়নে এই ধ্যানপরায়ণা রমণীকে দেখিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগী গম্ভীর স্বরে বলিলেন “শিবম্, শিবম্, শিবম্।” রমণী চক্ষু উন্মিলন করিলেন;—উত্থানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র নানা বল্লরী কর্তৃক তিনি জড়িতা হইয়াছিলেন,—তাঁহার কেশে আঘাত লাগিল। তখন তিনি ফিরিয়া এক একটী করিয়া সকল গুলি লতা ছিন্ন করিলেন, তৎপরে উঠিয়া যোগীকে প্রণাম করিলেন। তিনি কহিলেন, "বৎসে, আমি এই পথে যাইতে যাইতে তোমায় ধ্যানে মগ্না দেখিলাম; তোমার অলৌকিক ধ্যান দেখিয়া আমি তোমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছি,—তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তোমার আশ্চর্য্য ধ্যান, তোমার আশ্চর্য্য প্রার্থনা। নারী জীবনের পরিবর্ত্তে পুরুষ জীবন প্রার্থনা কর কেন?" তখন সেই রমণী কহিলেন, "মহাত্মন, কিছুই আপনার অবিদিত নাই। যখন দাসীর প্রতি করুণা করিয়াছেন তবে শুনুন; আমার বাড়ী নবদ্বীপ, তথায় নিমাই পণ্ডিত লোককে হরি নাম শিক্ষা দিতেছেন। আমি তাঁহাদের হরিনাম গান শুনিয়া যেন পাগল হইলাম, আর গৃহে থাকিতে পারিলাম না,—আমি তাঁহাদের মত হরিনাম গাইতে চাহিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমাকে তাহা করিতে দিলেন না,—বলিলেন 'তুমি স্ত্রীলোক।' আমার বড় দুঃখ হইল, স্ত্রীলোক বলিয়া আমি হরিনাম গানের বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম! সেই দিনই গৃহ ত্যাগ করিলাম। শুনিয়াছিলাম ধ্যান করিলে হরি দেখা দেন,—তিনি প্রহ্লাদকে, ধ্রুবকে দেখা দিয়াছিলেন; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম ধ্যান করিব, তার পর হরি দেখা দিলে তাঁহার নিকট পুরুষ হইবার জন্য বর চাহিব। চলিতে চলিতে এই বনে আসিলাম। এই নির্জ্জনে দুই বৎসর ধরিয়া হরির ধ্যান করিতেছি। এত দিন আমি ধ্যান করিতেছি, কেহ তো আমার ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই; তবে আপনিই কি অমার

হবি?" যোগী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তোমারই মতন একজন হরির প্রেমের ভিখারি মাত্র। তুমি আমা হইতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ; তোমার হরির প্রতি ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। বৎসে, গৃহে যাও, পুরুষ হইতে রমণী শতগুণে শ্রেষ্ঠ; পুরুষ রমণী হইবার জন্য যোগ সাধনা করে। মা ব্রহ্মময়ী স্বয়ং নারীজাতির একজন। যাও বৎসে, গৃহে যাও, গৃহে থাকিয়া, সংসারে থাকিয়া হরির দয়া ও ভালবাসা জগতে কার্য্যে প্রকাশ করিবার জন্যই তোমারা। নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া জগতে হরিনাম বিলাইতেছেন,—যাও গৃহে থাকিয়া তুমি সকলকে হরিনাম বিলাও।" রমণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি কি তাহা পারিব? আমাকে কি আর গৃহে লইবে, আমি যে বিধবা।" সন্ন্যাসী আবার কহিলেন, "যাও বৎসে, গৃহে যাও, তুমি বিধবা,—তোমার স্বামী হরি। তোমাকে গৃহে লইবে না? তুমি স্বয়ংই গৃহ; যাও বৎসে, কঠোর তপস্যা নারী জাতির জন্য নহে।" মস্তক অবনত করিয়া রমণী শুনিতেছিলেন, যোগী নিরস্ত হইলে রমণী মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন যোগী অন্তর্ধ্যান হইয়াছেন।

(৪)

যাঁহার কথা আমরা বলিতেছি সেই অভয়া বৈষ্ণবীর জীবনের দুইটী চিত্র আমরা উপরে অঙ্কিত করিলাম। নবদ্বীপের বাজারে হরিচরণ দাস নামক এক ব্যক্তির একখানি সামান্য মুদির দোকান ছিল;—হরি দোকান খানি হইতে এককপ দশ টাকা পাইয়া সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। একটী স্ত্রী, একটী বৃদ্ধা ভগিনী, একটী পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া হরির সংসার—

সুতরাং হরি যাহা পাইত তাহাতেই হরির স্ত্রী বলিত যে তাহারা "রাজার হালে আছে।" একটী দুঃখ ভিন্ন তাহাদের আর কোনই দুঃখ ছিল না,—তাহাদের একমাত্র কন্যা অভয়া বিবাহের সাত দিন পরে বিধবা হইয়াছিল। হরির স্ত্রী এই জন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিত। বাজারে তিনখানি গৃহ লইয়া হরির বাসস্থান; সম্মুখের খানিতে দোকান। হরির পুত্র জীবন এই গৃহেই বাস করে, অপর একখানি ঘরে হরি সস্ত্রীক শয়ন করে, অপর খানির এক পার্শ্বে রন্ধনাদি হয়, অপর পার্শ্বে একখানি মাঁচা আছে, ঐ মাঁচায় অভয়া ও তাঁহার পিশিমাতা শয়ন করেন।

অতি শৈশব হইতেই অভয়ার মূর্চ্ছার পীড়া ছিল। আকাশে মেঘ দেখিলে, রামধনু দেখিলে, চন্দ্র দেখিলে অভয়া মূর্চ্ছিতা হইতেন;—সকলে বলিত অভয়ার একটু 'ছিট' আছে। অভয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের হইলে হরিচরণ কন্যার বিবাহ দিল। পাগলকে ও মূর্চ্ছারোগাক্রান্তকে সহজে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না; সুতরাং হরিচরণ কন্যার বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু কন্যার বর পাওয়া বড়ই সুকঠিন হইয়া উঠিল। অভয়ার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এমন সময়ে গুপ্তিপাড়ার রামচরণ নামক এক যুবকের সহিত হরিচরণ কন্যার বিবাহ দিল। কন্যা প্রথম শ্বশুর বাড়ী গেল, কিন্তু বিবাহের দশ দিন পরে ফিরিয়া আসিল। রামচরণ বিবাহের সাত দিন পরে বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হইল। অভয়া কুমারী ছিল, সাত দিবসের জন্য সধবা হইল, তৎপরে আজীবনের জন্য বিধবা হইল।

অৰ্দ্ধ পাগলিনী যুবতীবিধবাকে লইয়া যে তাঁহার পিতা মাতার কতকষ্ট তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন।

বিবাহের ছয় মাস পরে অভয়া এক দিন দুই প্রহ-রের সময় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বালি লইয়া খেলা করিতেছিল, নিকটে একটি সুন্দর যুবক বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছিলেন। ঘাটে সেই সময় অনেক লোক স্নান করিতে-ছিল, কত জন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছে,—কত জন বালি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, সুতরাং কেহই অভয়াকে বা এই যুবককে লক্ষ করিতেছিল না। যুবক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন,—কিন্তু অভয়া বঙ্কিম নেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছিল। ক্রমে ঘাট হইতে একে একে সকলে চলিয়া গেল, কেবল যুবক থাকিলেন,—তাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিক তখনও শেষ হয় নাই। যখন অভয়া দেখিল যে ঘাটে আর কেহ নাই, তখন সে নিঃশব্দে বালির একটি তাল করিল ও নির্ব্বিবাদে সেই তালটি যুবকের সম্মুখস্থ কোসার ভিতর নিক্ষেপ করিল। সেই শব্দে যুবক চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন,—দেখিলেন অভয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে; তিনি তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। অভয়া যেন কিছু লজ্জিতা হইল, কিন্তু সে চলিয়া গেল না, একটু দূরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিলেন,—তৎপরে অভয়াকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অভয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিল, তখন তিনি কহিলেন, "যাহার জন্য, যে সুখের প্রত্যাশায় তুমি আমাকে চাহ সে সুখ

ক্ষণস্থায়ী। যদি সেই সুখ আজীবন দিবারাত্রি ভোগ করিতে চাহ তবে হরির ভজনা কর। কৃষ্ণ ষোলশত গোপিনীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন,—যে তাঁহাকে ভজিবে তিনি তাহারই মনোরঞ্জন করিবেন।" অভয়া বলিল, "আপনি দেবতা, আপনি অন্তর্যামী না হইলে আমার মনের কথা কেমন করিয়া জানিলেন। কৃষ্ণ কোথায়? কি করিলে তাঁহাকে পাইব? আমার প্রাণের ভিতর হু হু করে,—আপনি আমায় বাঁচান।" যুবক তখন নিজ কোষা হইতে জল লইয়া অভয়ার মস্তকে সিঞ্চন করিলেন, তৎপরে অভয়ার মস্তক মুখের নিকট আনিয়া তাহার কর্ণে কি বলিলেন। তৎপরে অভয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল; তখন যুবক নিজ কোষা কুশি ইত্যাদি গাত্র মার্জ্জনী মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। বলিতে হইবে কি যে যুবক নবদ্বীপের নক্ষত্র শ্রীগৌরাঙ্গ।

সেই দিন হইতে অভয়ার পাগল হইতে যে টুকু বাকি ছিল তাহা হইল। অভয়া সম্পূর্ণই পাগল হইল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলের সম্মুখে অভয়া সহসা আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নাচিতে নাচিতে গীত ধরিল,—

"মন মজিল আজ সই কালারে হেরিয়ে,
কালা ডাকে আয় আয়,
আর কিলো প্রাণ ঘরে রয়,
কালা বলে আয়না চলে, তোরা সব আয়না ভুলে;
স্থান দিবলো সই তোরে এ হৃদয় পেতে;
মন মজিল আজ সই কালারে হেরিয়ে।"

জীবন স্বভাবতই উদ্ধত,—ভগিনীকে কুৎসিত গান গাইতে শুনিয়া সে ক্রোধে অন্ধ হইল ও অভয়াকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। তখন অভয়া গাইল,—

"চিনেছি তাঁরে ভাই, আমি তাঁর ধরেছি পায়,
মার ধর আর খুন কর,
আমি ছাড়িবনা, ছাড়িবনা, ছাড়িবনা, তাঁয়।
মোরে ধর ধর, ধর ধর,
ওই তিনি, এত সুখ ভাই সহা নাহি যায় ;
চিনেছি তাঁরে ভাই আমি তাঁর ধরেছি পায়।"

জীবন ভগিনীকে যত প্রহার করে, অভয়া ততই গান গায়। তখন জীবন ভগিনীর হস্ত পদ দৃঢ় রজ্জুতে বন্ধন করিয়া তাহাকে দাওয়ায় ফেলিয়া রাখিল। অভয়া তখন মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। শীঘ্র চতুর্দ্দিকে অভয়ার নূতন প্রকারের উন্মত্ততার কথা রাষ্ট্র হইল। কত জন কত কথা বলিতে লাগিল। বাজারের মধ্য দিয়া একজন বৈষ্ণব যাইতেছিলেন, তিনি অভয়ার সঙ্গীত ও মূর্চ্ছার কথা শুনিয়া বলিলেন "হরির লীলা বুঝে কে। এই বালিকাতে হরি আবির্ভূত হইয়াছেন,—বালিকার 'দশা' হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া একজন বলিল "ঠাকুর, হরি ফরি নয়,—ছুঁড়ীটাকে ভূতে পেয়েছে।" বৈরাগী আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় যখন বাজারের মধ্য দিয়া নিমাই পণ্ডিত স্বদলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন তখন অভয়া আসিয়া তাঁহাদের মধ্য পড়িয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। জীবন ও হরিচরণ আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইয়া বাঁধিয়া

রাখিল। পরদিবস সন্ধ্যাকালে যখন আবার বাজারের মধ্য দিয়া সংকীর্ত্তন যায় তখন অভয়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়া আবার সংকীর্ত্তনের দলে মিলিত হইল। ইহা ও তৎপরে যাহা হয় পাঠক তাহা অবগত আছেন।

(৬)

যখন অভয়া আসিয়া সংকীর্ত্তনের দলে পড়িল তখন চতুর্দ্দিকে একটা গোল পড়িয়া গেল, চারিদিক হইতে লোক ছুটিল। অভয়া সঙ্কীর্ত্তনের দলের মধ্যে আসিয়াই মূর্চ্ছিতা হইল। তখন সেই মূর্চ্ছিত দেহ ধারণ করিয়া নিমাই দণ্ডায়মান হইলেন, অভয়ার সুদীর্ঘ কেশ তাঁহার পৃষ্ঠোপরি লম্বমান হইল, অভয়ার অবশ মস্তক তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল,—তখন তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া জীবন ও হরিচরণ ভয়ানক রাগত হইয়া বৃহৎ লাঠি লইয়া বৈষ্ণব দিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় বাজারের অনেকেই হরিচরণের পক্ষ অবলম্বন করিল,—তখন চারিদিক হইতে বৈষ্ণবগণের উপর লাঠি বর্ষণ হইতে লাগিল। কয়েক জনের মস্তক ফাটিয়া গেল, কয়েকজন রক্তাক্ত কলেবর হইলেন,—কয়েকজন মূর্চ্ছিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। নিমাইও আত্মরক্ষার্থ ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন মূর্চ্ছিতা অভয়ার কেশাকর্ষণ করিয়া জীবন তাহাকে টানিতে টানিতে গৃহে লইয়া গেল।

পর দিবস নিমাই নিজ বন্ধুবর্গকে একত্রিত করিয়া কি

করা কর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিল যে তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোককে আসিতে দেওয়া এক্ষণে কর্ত্তব্য নহে। নিমাইয়ের অনিচ্ছা সত্বেও অবস্থানুসারে নিমাই তাঁহাদের মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। পর দিবস কোন গতিকে অভয়াকে বলিয়া পাঠান হইল যে "তুমি স্ত্রীলোক,—স্ত্রীলোকের এরূপ সঙ্কীর্ত্তনে পুরুষদিগের সহিত যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি আর সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার ইচ্ছা করিও না;—ইহা নিমাই পণ্ডিতের অনুরোধ।"

তৎপর দিবস নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইল যে অভয়া পলাইয়াছে। তাহার কত অনুসন্ধান হইল কিন্তু কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। অভয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়া তবে নবদ্বীপ হইতে এত দূরস্থ মালদহের অরণ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর আমরা বর্ণন করিব না। এই অরণ্যে অভয়া দুই বৎসর হরিধ্যান করিলেন, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল পাঠক তাহা অবগত আছেন।

(৭)

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবদ্বীপের বাজারে একতারা বাজাইয়া গান গাইতে গাইতে একটী বৈষ্ণবী প্রবেশ করিল। বৈষ্ণবী গাইতে ছিল ;—

"যে জন মাতিবে, সে জন পাইবে,
বৈকুণ্ঠ সুখ এ ধরার মাঝে ;
কিসেরে মাতিব, কোথা তা পাইব,
যাহার হৃদয় সদাই নাচে।

কিসের ভাবনা, কিসের ভাবনা,
প্রেম ধন কালা দুহাতে দেয় ;
কুড়ায়ে লওরে, হৃদয়ে রাখরে,
মাতিয়ে যাইবে আপনিই তায়।
জগত জুড়িয়ে, মধুরে মিশিয়ে,
কালার বাঁশরী ওইতো বাজে :
নিলাভ আকাশে, ব্রহ্মাণ্ড বিকাশে,
কালাই আমার ওইতো নাচে।
যে জন মাতিবে, সে জন পাইবে,
বৈকুণ্ঠ সুখ এ ধরার মাঝে ;
জগত জুড়িয়ে, মধুরে মিশিয়ে,
কালার বাঁশরী ওই যে বাজে।

চারিদিক হইতে লোক জমিতে লাগিল। বৈষ্ণবীর গম্ভীর মূর্ত্তি, সাম্যভাব ও মধুর সঙ্গীত সকলের প্রাণের ভিতরই যেন প্রবিষ্ট হইয়া একরূপ বিমল আনন্দ দান করিতে লাগিল। নিমাই যখন প্রথম নবদ্বীপে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, সে সময়ে আর এ সময়ে অনেক প্রভেদ। এক্ষণে নবদ্বীপের শিরায় শিরায় হরিনাম ও হরিপ্রেম প্রবাহিত হইতেছে ; পূর্ব্বে যাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই নবদ্বীপের বৈষ্ণব চূড়ামণি। যাঁহারা পূর্ব্বে নিমাইয়ের সঙ্কীর্ত্তনেরদলের উপর পড়িয়া লাঠি চালাইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন করিতেছেন। নিমাই আর এক্ষণে নবদ্বীপে নাই। এক বৎসর হইল তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জগতে হরিপ্রেম বিলাইতে বহির্গত

হইয়াছেন। নবদ্বীপে যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার নামে জ্বলিয়া যাইতেন, তাঁহারাই এক্ষণে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া পূজা করিতেছেন,—সুতরাং বৈষ্ণবীর একতারার সুমধুর ধ্বনির সহিত বিমিশ্রিত,—

"নিলাভ আকাশে, ব্রহ্মাণ্ড বিকাশে,
কালাই আমার ওইতো নাচে"

শুনিয়া সকলেই একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। বৈষ্ণবী যেই সঙ্গীত শেষ করিলেন, অমনি জনতার মধ্য হইতে বাহু উত্তোলন করিয়া একজন বলিয়া উঠিল "বল হরি,—হরিবোল।" অমনি চারিদিক হইতে "বল হরি, হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইল।

দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবীর কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল,—চারিদিক হইতে বৈষ্ণবগণ খোল, করতাল, শিঙ্গা লইয়া বহির্গত হইয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যে দিবস নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সেই দিবস নিজ অনুচরদিগকে বলিয়া যান যে, "আমি চলিলাম বটে,—কিন্তু এক বৈষ্ণবী আসিয়া শীঘ্রই তোমাদের নেতা হইবেন; তোমরা সকলে তাঁহার প্রতীক্ষা কর।" বৈষ্ণবগণ এ কথা ভুলেন নাই,—যেই শুনিলেন যে এক বৈষ্ণবী নবদ্বীপের বাজারে আসিয়াছেন, অমনি যিনি যেখানে ছিলেন, খোল করতাল লইয়া সকলে বাজারের দিকে ছুটিলেন। যাঁহারা এক সময়ে স্ত্রীলোককে দলে লইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে চলিলেন। যে জীবন ভগ্নীকে প্রহার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, সেই জীবন, হরি মুদির

পুত্র, এক্ষণে একজন প্রধান বৈষ্ণব; অনেক ব্রাহ্মণ তাহার পদ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন সার্থক মনে করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ বাজারে আসিয়া ব্যগ্র হইয়া সকলে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; জীবন হস্তে সিঙ্গা লইয়া জনতা ভেদ করত "মা এসেছেন, বল গৌরাঙ্গের জয়" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, বৈষ্ণবীর সম্মুখে আসিয়া জীবন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "এ যে অভয়া!" "দাদা, আমি এসেছি," এই বলিয়া অভয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিল, চতুর্দ্দিকে মহা-গোল উঠিল, বৈষ্ণবগণ খোল করতাল বাজাইয়া উঠিলেন। তখন বাজার সুদ্ধ লোক নৃত্য আরম্ভ করিল। সেই গোলযোগের মধ্যে একদল লোক গাইতেছিল,—

"মন মজিল আজ সই কালারে হেরিয়ে।"

আর একদল গাইতেছিল,—

"নিলাভ আকাশে, ব্রহ্মাণ্ড বিকাশে,
কালাই আমার ওইতো নাচে।"

আর কে কি বলিতেছিল তাহা বুঝা যাইতেছিল না। যাহা জীবনের নিকট একদিন ঘোর অশ্লীল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজ তাহাই তাঁহার নিকট অতি ভাবময় গীত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মানুষ, তাঁহার সম্মুখে ভেদাভেদ নাই।

(৭)

কবি সকলেই, যাহার হৃদয়ের ভাবস্রোত বাক্যে বহির্গত হইতে পারে সেই জগতে কবি বলিয়া খ্যাত হয়। কাল যে 'ক' বলিতে পারিত না, আজ সে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। ভারতের প্রাচীন কবিগণ প্রায় সকলেই এইরূপ

করিয়া কবি। হরি মুদির মেয়ে কবি হইবে আশ্চর্য্য কি?
আমরা অভয়া বৈষ্ণবীর যে কয়েকটি গীত জানি তাহাই এই ইতিহাসের স্থলে স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। আরও কয়েকটি দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক।

নিমাই পুরুষ মাতাইয়াছিলেন, এক্ষণে অভয়া স্ত্রীলোক মাতাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের সমস্ত বিধবা গেরুয়া বসন পরিধান ও তিলক ব্যবহার আরম্ভ করিল। যে সকল বৈষ্ণবগণ বিবাহিত তাহাদের স্ত্রীগণ শীঘ্রই বৈষ্ণবী হইলেন। নিমাই নবদ্বীপ যত মাতাইয়াছিলেন, অভয়া বৈষ্ণবী নিমাইয়ের সহধর্ম্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাহা হইতে সহস্র গুণে নবদ্বীপকে মাতাইয়া তুলিলেন। নিমাইয়ের হরিপ্রেম উপরে ভাসিত, অভয়ার হরিপ্রেম বঙ্গগৃহের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে অভয়ার গীত ও অভয়ার ছড়া, বাঙ্গালীর মেয়ে মাত্রেরই ওষ্ঠে ওষ্ঠে হইল; ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, কাশী, বৃন্দাবনেও ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে বোধহয় অভয়া বৈষ্ণবী কোন না কোন সময়ে বৃন্দাবন পর্য্যন্তও গিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার জীবনের এই অংশের কোন বিষয়ই জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তিনি কত বয়সে, কিরূপ অবস্থায়, কোন স্থানে মানব লীলা সম্বরণ করেন তাহাও জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, কে বলে বঙ্গভূমে রত্ন নাই?

রাণী প্রেমময়ী।

(১)

ভোলপুর ষ্টেশণ হইতে যে পথ ইলামবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে ঐ পথ কিছুদূর গিয়া একটী নিবিড় শাল বনের মধ্য দিয়া বিস্তৃত। এই শালবনের গভীরতর প্রদেশে একটী সুন্দর পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে; একটু বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার চতুর্দ্দিকে ভগ্ন ইষ্টক-স্তুপ অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল আমি কয়েকজন শিকারীর সহিত এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম. ও ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা সকলে দুই প্রহরের সময় এই পুষ্করিণী তীরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করায় শিকারীরা আমাকে বলে যে এই স্থানে "প্রেমপুর" নামে এক বৃহৎ নগর ছিল; এই নগরে বরনী রাজার বাড়ী ছিল, আর এই পুকুরের নাম 'প্রেম পুকুর'। ইহারা আমাকে অন্য কোন সংবাদ দিতে পারিল না। আমি ইলাম বাজার হইতে কেঁদুলী বা কেন্দবিল্বের বিখ্যাত মেলা দেখিতে আসিলাম। ইহা কবি চূড়ামণি জয়দেবের জন্মভূমি, আর তাঁহারই নামে প্রতিবৎসর এই মেলা হইয়া থাকে। এই স্থানে জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভিখারীর সহিত আমার আলাপ হইল; কথায় কথায় শালবন মধ্যস্থ পুষ্করিণীর কথা উঠিল, তখন তিনি বলিলেন, "ও পুষ্করিণীর নাম 'প্রেমপুকুর' ঠিক নহে, উহার নাম 'প্রেম সরোবর', আর যে নগর ঐ স্থানে এক সময় বিদ্যমান

ছিল তাহার নাম 'প্রেমময়ী'।" তিনি এই নগরের বিষয় কিছু অবগত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তাহা আজি আপনাকে বলিতেছি।" তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে আমি তাহাই বলিতেছি।

(২)

যে স্থানে "প্রেমময়ীর" ভগ্নস্তুপ বিদ্যমান রহিয়াছে প্রায় তিন শত বৎসর হইল ঐ স্থানে গবিন্দপুর নামে এক নগর ছিল। ঐ নগরে রাজা ব্রহ্মবর্ত্ত রায় নামে এক মহা পরাক্রান্ত রাজা বাস করিতেন। চতুর্দ্দিকে চারি দিবসের পথ ব্যাপিয়া সমস্ত প্রদেশ তাঁহার রাজ্যাধীন ছিল। রাজা ব্রহ্মবর্ত্তের পূর্ব্ব পুরুষেরা দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে এই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে গবিন্দপুরে রাজা ব্রহ্মবর্ত্ত রাজত্ব করিতেছিলেন,—রাজা ব্রহ্মবর্ত্তের কেবল "প্রেমময়ী" নাম্নী একটি কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। এই সময়ে প্রেমময়ীর বয়স দ্বাদশ বৎসর, সুতরাং রাজা নিজ মন্ত্রীপুত্র সুবুদ্ধিকেশরীর সহিত প্রাণসমা কন্যার বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছিলেন। বাল্যকাল হইতে প্রেমময়ী সুবুদ্ধির সহিত একত্রে বাস ও একত্রে ক্রীড়া করিতেন, স্বভাবতই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রণয় অতিশয় গাঢ়তর হইয়াছিল। তাঁহাদের বিবাহ হইবে ইহাতে তাঁহাদের সেই পূর্ব্বের ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; বিবাহ কি, তাহা উভয়েই ভাল বুঝিতে পারেন নাই—কারণ সুবুদ্ধিকেশরীর বয়সও তখন অষ্টাদশ বৎসর মাত্র।

এই সময়ে সহসা কোথা হইতে কাল মেঘ প্রেমময়ীর

অদৃষ্টাকাশে উদিত উইল। সেই সময় বরগীর অত্যাচারে বঙ্গভূমি উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাহারা কোন না কোন গ্রাম লুট করিত। কি রাজা কি প্রজা সকলেই এই মহারাষ্ট্রদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। প্রেমময়ীর বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে একদিন রাত্রিকালে একদল বরগী আসিয়া রাজা ব্রহ্মবর্ত্তের প্রাসাদ আক্রমণ করিল; রাজা অমানুষিক সংগ্রাম করিয়া হত হইলেন, রাজপ্রাসাদ, সমস্ত নগর ও চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লী দুর্দান্ত বরগী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল,—সহস্র সহস্র নরনারী জীবন হারাইল, যাহারা অরণ্যে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিল তাহারাই কেবল বাঁচিল। বরগীরা নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান কালে নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রস্থান করিল, গবিন্দপুর দেখিতে দেখিতে ভষ্মীভূত হইয়া গেল। প্রেমময়ী ভিন্ন সেই লোকারণ্য রাজবাড়ীর একটি জীবও জীবিত ছিল না। যখন সুবুদ্ধিকেশরী দেখিলেন রাজা হত হইলেন, রাজমহিষী ও রাজপরিবারগণ নিহত হইতে লাগিলেন, রাজপ্রাসাদ রক্ষার আর উপায় নাই, তখন প্রেমময়ীর মূর্ত্তিই তাঁহার চক্ষুর উপর নাচিতে লাগিল। তিনি সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিতা প্রেমময়ীকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিলেন, তৎপরে লম্ফে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিলেন; প্রেমময়ীর প্রাণ রক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য, নিজের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। যতক্ষণ সূর্য্য পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া উদিত না হইলেন ততক্ষণ সুবুদ্ধিকেশরী কেবলই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াছিলেন; যখন দেখিলেন সূর্য্য উদিত হইল, তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রেমময়ীকে ভূমিতলে শয়ন করাইলেন,—অনেক যত্নে ও ক্লেশে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। প্রেমময়ী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি অনেক কষ্টে প্রেমময়ীকে সমস্ত কথা বুঝাইলেন; তাহার পর প্রেমময়ীর ক্রন্দন আর ক্ষান্ত হয় না; প্রেমময়ীকে শান্ত করিতে গিয়া সুবুদ্ধিকেশরী আপনিই উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি নিজের হৃদয়বেগ নিজ হৃদয়ে লুক্কায়িত করিয়া প্রেমময়ীকে অনেক ক্লেশে শান্ত্বনা করিলেন। আর গবিন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তনে লাভ কি? তথায় যাইয়া আর তাঁহারা কি করিবেন? তত্রাচ প্রেম বুঝে না; কি করেন, তথায় আসিলেন,—আসিয়া দেখিলেন, সেই সুন্দর নগর একেবারে শশ্মান হইয়া গিয়াছে। তখন সুবুদ্ধিকেশরী বলিলেন, "চল প্রেম, আমরা আমার মাতুলালয়ে যাই.—সে এখান হইতে নিকট। তুমি রাজার কন্যা, বিপদে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার উপযুক্ত নহে।" নিকটে একটি মানুষও জীবিত নাই যে তাহার সাহায্যে কোন যান সংস্থান করিবেন, অগত্যা উভয়ে পদব্রজে চলিলেন। আদরের পুতলী রাজার কন্যা প্রেমময়ী কি হাঁটিতে পারে? দুই পা হাঁটিতে না হাঁটিতে দর বিগলিত ধারে সেই কোমল পুষ্পবিনিন্দিত চরণযুগল হইতে রুধির বহিতে লাগিল। একটি কুকুর এই রক্ত জিহ্বা দ্বারা লেহনে উদ্যত হইল,—প্রেমময়ী তখন ফিরিয়া কুকুরের পৃষ্ঠে হস্ত সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "দেখ আমার মহেশ্বর এসেছে।" সুবুদ্ধিকেশরী দেখিলেন, বলিলেন, "বোধ হয় আমরা তিন জনই বাঁচিয়া আছি।" মহেশ্বরকে প্রেমময়ী অতি শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়াছিলেন; যেখানে প্রেমময়ী, মহেশ্বরও

সেই খানে। যখন রাত্রিকালে সুবুদ্ধিকেশরী প্রেমময়ীকে লইয়া পলায়ন করিলেন, মহেশ্বরও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিল;— এতক্ষণ উভয়ের কেহই তাহাকে দেখেন নাই।

ধীরে ধীরে তিন জনে চলিলেন—উপরে আকাশে সূর্য্য ক্রমেই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে উভয়ে কিয়দ্দূর আসিলেন,—প্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকা স্তূপের উপর দিয়া যাইতে প্রেমময়ীর চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল—নিকটে একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ দেখিয়া প্রেমময়ী কহিলেন, "চল, ঐ গাছতলায় একটু বসি, আর যে চলিতে পারি না। তুমিও দাঁড়াইতে পারিতেছ না, চল ঐ খানে একটু বিশ্রাম করি।" সত্য সত্যই সুবুদ্ধি কেশরী আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না,—তিনি কয়েক স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে রক্তক্ষয় হওয়ায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণীত হইতেছিল, তিনি কলের পুত্তলীর ন্যায় চলিয়াছেন। প্রেমময়ীর পাছে ক্লেশ হয়, প্রেমময়ী পাছে ভীতা হয়, এই ভাব মনে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়াই তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। যখন বট বৃক্ষের তলে আসিলেন তখন আর তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না, "প্রেম—প্রেম, আমায় ধর—ধর" এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। প্রেমময়ী বালিকা,—কিন্তু প্রেমময়ী সেই জাতির এক জন যে জাতি মানবজাতির মাতা। প্রেমময়ী নিজের সমস্ত ক্লেশ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন; জল আনিয়া সুবুদ্ধির চেতনা সম্পাদন করিবেন বলিয়া রাজার কন্যা কৃষক বালার

ন্যায় নিকটস্থ অজয় নদীর দিকে ধাবিতা হইলেন। প্রেম জলে নামিলেন, নিজ বহুমূল্য বস্ত্র জলে নিমগ্ন করিয়া লইলেন কিন্তু যেমন ব্যাকুলচিত্তে দ্রুতবেগে উঠিবেন, অমনি তাঁহার পদস্খলন হইল,—প্রেমময়ী একেবারে অগাধ জলে যাইয় পড়িলেন। দুই তিন বার উত্থানের জন্য চেষ্টা করিলেন, তৎপরে জলে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে তীর হইতে কে এক জন আইয়া জলে ঝম্প প্রদান করিয়া পড়িল।

(৩)

যে বটবৃক্ষ তলে সুবুদ্ধিকেশরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রেমময়ীর জল মগ্নের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সেই পথ দিয়া পাল্কি করিয়া একজন বৃদ্ধ যাইতেছিলেন। তিনি পথি মধ্যে এই সুন্দর যুবককে এরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া যুবকের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; পরে পাল্কি হইতে একটী ক্ষুদ্র থলি মধ্যে হইতে ঔষধি বহিষ্কৃত করিয়া যুবককে সেবন করাইলেন; পরে যুবককে নিজ পাল্কিতে শয়ন করাইয়া নিজে পদব্রজে চলিলেন। এই বৃদ্ধ নিকটস্থ কেন্দবিল্ল গ্রামবাসী, নাম ধর্ম্মবীর কবিরাজ, চিকিৎসা ব্যবসায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার নাম খ্যাত ছিল। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে চিকিৎসায় গিয়াছিলেন, গবিন্দপুর ধ্বংসের সমস্ত সংবাদ পথিমধ্যে শুনিয়াছিলেন, সুতরাং যুবককে এরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। ভাবিলেন কল্য রাত্রির ঘটনার এ সামান্য একটী চিহ্ন মাত্র। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি জীবিত আছে দেখিয়া তিনি সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

ধর্ম্মবীর কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে সুবুদ্ধিকেশরী এক মাস বাস করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট তিনি মন্ত্রীপুত্র তাহা গোপন করিলেন, জনৈক বণিকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কোথায় যাইবেন স্থির না হওয়ায়, আজ যাই কাল যাই করিয়া প্রায় আরও এক মাস কাটিয়া যায় যায় হইল, কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। এমন সময়ে এক দিবস কেন্দবিল্লে দুর্দ্দান্ত বরগী আসিল; চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন আরম্ভ হইল,—কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীও তাহারা পরিত্যাগ করিল না। সুবুদ্ধিকেশরী বরগীর উপর মর্ম্মান্তিক রাগত ছিলেন; সুতরাং যখন একদল বরগী আসিয়া কবিরাজের বাটী লুণ্ঠনের উদ্যোগ করিল, তখন তিনি এক অসি হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আয় কে আসিবি আয়।" তাঁহার অসি নিয়ে দেখিতে দেখিতে প্রায় দ্বাদশ জন আহত ও হত হইল; অসংখ্য বরগী প্রাণপণে গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, তত্রাচ পারিতেছে না; যুবকের এই অসমসাহসিক সাহস দেখিয়া একজন কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "এমন বীরের সহিত এরূপ যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে—সকলে নিরস্ত হও ও সরিয়া যাও।" অমনি বরগীগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ পদ হইল, তখন একটী অতি সুন্দর অশ্ব পৃষ্ঠে এক জন বরগী বীর দ্বারের সম্মুখে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন, "আমি ভাস্কর পণ্ডিত,—তোমার বীরত্বে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি; যুবক, তুমি মহারাষ্ট্র সেনানী মধ্যে কার্য্য গ্রহণে ইচ্ছা কর?" সুবুদ্ধি-কেশরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "করি।" মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বলিলেন, "তোমাকে পাঁচ শত অশ্বারোহীর

সেনাপতি করিলাম।” তৎপরে নিজ অধীনস্থ এক জনকে বলিলেন, “যুবককে উপযুক্তরূপে সজ্জিত কর।”

ভাস্কর পণ্ডিতকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সুবুদ্ধিকেশরী এক সহস্র সেনার সেনাপতি হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি মহারাষ্ট্র বীরের নিকট রাজা উপাধি পাইলেন - তিন বৎসরের শেষ ভাগে ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহাকে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিতে আজ্ঞা দিলেন ও ঐ সকল প্রদেশে মহারাজাধিরাজ উপাধি লইয়া মহারাষ্ট্রদিগের নামে শাসন কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মহারাজাধিরাজ সুবুদ্ধিকেশরী গবিন্দপুরে আসিয়া তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে তথায় মহাড়ম্বরে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বঙ্গদেশে তিনি বরগী রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন। আর যাহার গবিন্দপুর রাজ্য প্রাপ্তির কথা সেই প্রেমময়ীর কি হইল?

(৪)

প্রেমময়ী জলমগ্ন হয়েন দেখিয়া প্রভুভক্ত মহেশ্বর এক লম্ফে জলে পতিত হইয়া মগ্নপ্রায়া প্রেমময়ীর সেই ঘন নিরদ সদৃশ কেশগুচ্ছ কামড়াইয়া ধরিল। প্রেমময়ী আশ্রয় পাইয়া একেবারে মহেশ্বরকে জড়াইয়া ধরিলেন; মহেশ্বরের আর সন্তরণের ক্ষমতা রহিল না, অতি কষ্টে সে নিজ প্রভু কন্যার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইল সত্য, কিন্তু তীরে আসিতে পারিল না। তখন সেই কুকুর পৃষ্ঠে প্রেমময়ী অজয় নদের বিচিমালা পরিপূরিত বক্ষে ভাসিয়া চলিলেন। এই রূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কুকুরও প্রেম মৃত্তিকা স্পর্শ

করিলেন, দেখিলেন স্রোতবেগে তাঁহারা কূলে আনীত হইয়াছেন। তখন প্রেম তীরে উঠিলেন। সেই ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিকালে অসহায়া রাজকন্যা কোথায় যাইবেন? কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সেই বালুকাময় তীরে ক্লান্তকায়া ও পরিশ্রান্তা প্রেমময়ী নিদ্রিতা হইলেন। পার্শ্বে প্রিয় মহেশ্বর উপবেশন করিয়া রহিল। যখন আকাশে সূর্য্য উদিত হইল, যখন সেই সূর্য্য-কিরণ প্রেমময়ীর কপোলে পতিত হইল, তখন প্রেম জাগরিত হইলেন। কোথায় যাইবেন? প্রেম ব্যাকুল হইয়া সেই নির্জ্জন নদীতটে উপবেশন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়ে বঙ্গদেশ দস্যুর উৎপীড়নে অধীরা হইয়া উঠিয়াছিল। একদল দস্যু রাত্রিতে কোথায় স্বকার্য্যে-গমন করিয়াছিল, এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথি মধ্যে বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধানা বালিকাকে একাকিনী উপবিষ্টা দেখিয়া তাহাদিগের লোভ আকৃষ্ট হইল। সেই রোরুদ্যমানা বালিকার দেহ হইতে তাহারা একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইল; অবশেষে একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করাইয়া প্রেমময়ীর বস্ত্র পর্য্যন্ত তাহারা অপহরণ করিল। প্রেম কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার ক্রন্দনে সেই পাষাণ চিত্ত দস্যুদিগের দয়া হইল না, বরং প্রেমের অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া অনেকের কু অভিপ্রায় জাগ্রত হইল, কিন্তু 'সদ্দারের' ভয়ে কেহ সে ইচ্ছা প্রকাশে সাহসী হইল না। দস্যুরা প্রেমের সমস্ত লইয়া চলিয়া গেল, প্রেম সেই নদী তটে বসিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া প্রেমের নিকট উপস্থিত হইল; এ দস্যুদলেরই

একজন। প্রেমের রূপে উন্মত্ত হইয়াছিল; নানা ছলে নিজ দল ত্যাগ করিয়া প্রেমের নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছিল। যদি মহেশ্বর না থাকিত তবে দুরাশয় প্রেমের সতীত্ব নাশ পর্য্যন্তও করিত, কিন্তু মহেশ্বর তাহাকে কয়েক স্থানে দংশন করায় সে তখন ক্ষান্ত হইয়া প্রেমকে বন্ধন করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। সমস্ত দিবস অনাহারে প্রেম দস্যুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হইতে পদব্রজে চলিলেন, সন্ধ্যাকালে দস্যুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বাটী আসিয়া দস্যু তাঁহার হস্ত পদ দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করত এক প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া অন্য কার্য্যে গমন করিল। মহেশ্বর যদিও দস্যুর নিকট অনেক প্রহার সহ্য করিয়াছিল তত্রাচ প্রেমকে ত্যাগ করে নাই। এক্ষণে সে দরমার বেড়া পশ্চাত হইতে ভাঙ্গিয়া গৃহে আসিয়া প্রেমের রজ্জু নিজ সুতীক্ষ্ণ দন্তে ছেদন করিয়া ফেলিল; প্রেম মুক্ত হইলেন ও যে পথে মহেশ্বর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল সেই পথে তিনি পলাইলেন। অন্ধকার রাত্রে কণ্টকাকীর্ণ পথে অসহায়া বালিকা ছুটিল,—হায়, সুবুদ্ধিকেশরী তুমি এখন কোথায়! হায় রাজা ব্রহ্মবর্ত্ত, তোমাদের আদরের পুত্তলী প্রেমময়ীর ক্লেশ একবার দেখিয়া যাও!

পর দিবস এক গ্রামে এক দরিদ্রার দ্বারে এক মুষ্টি জঘন্য অন্ন ভোজন করিয়া প্রেমময়ী জীবন ধারণ করিলেন। এক দিবসে প্রেমময়ীর যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কাহারও শত বৎসরেও তত হয় না। প্রেমময়ীর কষ্ট দেখিয়া দরিদ্রা তাঁহাকে তাহার গৃহে আশ্রয় দিল; এই দরিদ্রার গৃহে রাজকন্যা কাটনা কাটিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কাঁদিতে কাঁদিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল; প্রেম সুবুদ্ধি

কেশ্বরীর বা মিজ নগরের কোন সংবাদই পাইলেন না। এক বৎসরান্তে বৃদ্ধার মৃত্যু হইল, জমিদার বৃদ্ধার যাহা কিছু ছিল লইতে লোক পাঠাইলেন, সে প্রেমকে দেখিল; জমিদার পুত্রকে সংবাদ দিল;—প্রেম অনুপায় দেখিয়া রাত্রি কালে সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। এ গ্রামে সে গ্রামে নানা স্থানে নানা রূপে অপমানিত হইয়া প্রেম প্রায় অনাহারে আর এক বৎসর কাটাইলেন। এক্ষণে আর তাঁহার সে রূপ নাই, রং কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল পড়িয়া পড়িয়া গণ্ডে দাগ হইয়া গিয়াছে। সেই অজানু-লম্বিত কৃষ্ণ কেশ জটাময় হইয়া গিয়াছে। প্রেম কোথাও দাসী বৃত্তি করিয়া, কোথাও কায়িক পরিশ্রম করিয়া এবং কোথায়ও জঘন্য ভিক্ষান্ন আহার করিয়া একবৎসর কাটাইলেন। হায়! কত দিন তিনি খাইতেও পান নাই, কত দিন উদরের জন্য কেবল কাঁদিয়াছেন. পরে জল মাত্র পান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন; হায়! কেজানে কাহার অদৃষ্টে কখন কি হয়। কালচক্রে রাজকন্যাও ভিখারিণী হয়! মহেশ্বরও আর সে মহেশ্বর নাই; রুগ্ন, ক্ষীণ, অনাহারে শীর্ণ, মহেশ্বরকে এক্ষণে দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রেমের ধন জন আত্মীয় স্বজন সকলই গিয়াছিল, কেবল মহেশ্বরই প্রেমের দুঃখের সাথি ছিল। যখন কোন কোন দিন প্রেম মহেশ্বরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেন, আর মহেশ্বরের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল বহিত, তখন বোধ হইত যেন সমস্ত পৃথিবীই কাঁদিয়া উঠিতেছে।

প্রায় সার্দ্ধ দুই বৎসর কাটিয়া গেলে প্রেম এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। এই পাষণ্ড

প্রেমকে প্রায়ই আহার প্রদান করিত না, সর্ব্বদাই কুৎসিত গালাগালি দিত ও সময়ে সময়ে অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রেমকে প্রহার করিত। প্রেম আর কোথায় যাইবেন? সুতরাং সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন।

(৬)

এক দিবস বৃদ্ধ প্রেমকে সঙ্গে লইয়া নিজ উদ্যানে প্রবেশ করিল; তথায় প্রেমের দ্বারা শুষ্ক বৃক্ষ শাখার রাশি কুড়াইয়া রাশি করিল, তৎপরে প্রেমকে সেই বৃহৎ মোট মস্তকে করিয়া, গৃহে লইয়া যাইতে বলিল। প্রেম নীরবে সেই বৃহৎ কাষ্ঠ রাশি তুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হায় তাঁহার শরীরে কি আর বল আছে! বৃদ্ধ তাহা বুঝিল না,—বলিল, "মাগীর নেকামি দেখ, তোল্ হারামজাদি, জানিস্ নে তোর হাড় গুঁড়ো করবো। কাজ করতে পারবিনেতো কাজ কর্ত্তে আসিস্ কেন?" তৎপরে বৃদ্ধ যেরূপ কুৎসিত ভাবে প্রেমকে গালাগালি দিল তাহা অব্যক্তব্য। প্রেম নীরবে আবার প্রাণপণে সেই কাষ্ঠ মস্তকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন বলিলেন, "দেখুন, আমি এত তুলিতে পারিতেছি না, দুই তিন বারে না হয় নিয়ে যাচ্চি।" "মুখের উপর জবাব।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই কাষ্ঠরাশি হইতে এক শাখা উত্তোলন করিয়া প্রেমকে প্রহার করিতে লাগিল,—প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা বহিল; অবশেষে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রেম সেই মোট মস্তকে লইলেন ও বৃদ্ধের গৃহাভিমুখে চলিলেন গৃহে যাইতে হইলে রাজপথের উপর দিয়া যাইতে হয়। রাজপথে সেই সময়ে অসংখ্য বরকন্দাজ সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল,

তাহারা কাহাকেও রাজপথ দিয়া যাইতে দিতেছে না। প্রেমকেও তাহারা যাইতে বারন করিল, কিন্তু প্রেম নিজ দুঃখেই অভিভূতা ছিলেন, তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন না, তিনি চলিলেন। একজন বরকন্দাজ আসিয়া তাঁহাকে এক ধাক্কা মারিল,—প্রেমের মস্তক হইতে কাষ্ঠরাশি রাজপথে পতিত হইল; তখন আরও দুই তিন জন আসিয়া প্রেমকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল; অবশেষে তাহারা প্রেমের মস্তকে সেই মোট তুলিয়া দিয়া প্রেমকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ও কুৎসিত গালাগালি দিতে দিতে পথের বাহির করিয়া দিল। প্রেম উদ্যানে ফিরিয়া আসিলেন, বৃদ্ধকে তাঁহার বাটী না যাওয়ার কারণ বলিলেন। বৃদ্ধ বলিল, "বুঝেছি বদমাইসী।" এই বলিয়া একটী বৃক্ষ শাখা দ্বারা প্রেমকে আবার সে প্রহার করিতে লাগিল। প্রেম চিৎকার করিয়া কাঁদিলে দুর্দ্দান্ত নররাক্ষস আরও প্রহার করে; প্রেম যাতনায় অস্থির হইয়া ধীরে ধীরে রাজপথের নিকট আসিয়া কাষ্ঠ ভূমিতলে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জীর্ণ শীর্ণ মহেশ্বর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

যাঁহার জন্য বরকন্দাজ দাঁড়াইয়াছিল কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিলেন। প্রথমে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য, পরে এক দল রণবাদ্যকর, তৎপরে আসাবরদার, ছাতিদার ইত্যাদি অসংখ্য লোক, সর্ব্বশেষে এক সুসজ্জ হস্তী পৃষ্ঠে তিনি, মহারাজাধিরাজ সুবুদ্ধিকেশরী অদ্য শিকারে চলিয়াছেন। প্রেম একবার হস্তীর দিকে চাহিলেন, সুবুদ্ধিকে চিনিলেন, তাহার পর তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে

পতিত হইলেন। মহেশ্বর এই ব্যাপার দেখিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সুবুদ্ধিকেশরীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল—তিনি মহেশ্বরকে চিনিলেন, অমনি হস্তী পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রেমের নিকট আসিয়া প্রেমের মস্তক হৃদয়ে লইয়া "জল, জল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজার এই ব্যবহারে সমস্ত সেনামণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, কয়েকজন জল লইয়া সসব্যস্তে রাজার নিকট আসিল। বহুক্ষণ যত্নের পর প্রেমের চেতনা হইল, তখন সুবুদ্ধিকেশরী বালকের ন্যায় চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; অবশেষে বলিলেন, "তোমার এই দশা,—আর আমি রাজ্য সুখে! আমি মরিলাম না কেন?" আমি তোমাকে কত খুঁজিয়াছি, তাহা কেবল বিধাতা জানেন।" তখন কাঙ্গালিনী প্রেমময়ী সুবুদ্ধিকেশরীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধিকেশরী কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া প্রেমকে লইয়া সেই হস্তী পৃষ্ঠে স্বর্ণ হাওদায় উপবেশন করাইলেন, নিজ মুকুট প্রেমকে পরাইয়া দিলেন, নিজগলা হইতে হীরক হার লইয়া প্রেমের গলায় পরাইয়া দিলেন আহা! সেই ছিন্নবসনা জটাজুটকেশী, অর্দ্ধমৃতার গলে এই হার কি শোভা ধারণ করিল তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত সৈন্যগণ আশ্চর্য্য হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। অবশেষে সুবুদ্ধিকেশরী কহিলেন, "হে অমাত্য ও সৈন্যগণ, ইনিই আমাদিগের রাজা ব্রহ্মবর্দ্ধের কন্যা,—রাজকুমারী প্রেমময়ী।" এই কথা শুনিয়া কেহই আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না; রাজা ব্রহ্মবর্দ্ধের জন্য সকলই দুঃখিত, তাঁহার কন্যার এই দশা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইল। তখন সুবুদ্ধিকেশরী বলিলেন, "এ

রাজ্য ইঁহার। আমরা বংশপরম্পরায় এই বংশের দাসত্ব করিয়া আসিতেছি, আজ হইতে আমি ইঁহার দাস; এ রাজ্য ইঁহার তোমাদের সকলের রাণী ইনি।” অমনি আকাশ কম্পিত করিয়া “মহারাণী প্রেমময়ীর জয়” শব্দ উত্থিত হইল। তখন চতুর্দ্দিকে এক মহাগোল উপস্থিত হইল—বাদ্য বাজিয়া উঠিল. যে সকল বরকন্দাজ প্রেমকে প্রহার করিয়া ছিল, তাহারা হস্তির সম্মুখে ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। প্রেমের প্রভু বৃদ্ধ গোল দেখিয়া নিকটে আসিয়া ব্যাপার বুঝিয়া একেবারে ভূমে গড়াইয়া পড়িল। এ দিকে সৈন্যগণ সকলে মহেশ্বরের প্রভুভক্তির কথা শুনিল, তখন তাহারা একেবারে তাহাকে মস্তকে তুলিল। মহেশ্বর এ আদর ভাল বুঝিল না, ভয়ানক চীংকার আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই আনন্দ উৎসবে তাহার আপত্তি কে শুনে? সেই সৈন্যরাশি “জয় মহারাণী প্রেমময়ীর জয়” শব্দে অগ্রসর হইল। তাহার পর আর বলিব কি—প্রেমের সহিত সুবুদ্ধিকেশরীর বিবাহ হইল। উভয়ের সন্তানাদি হইল, সন্তানাদি লইয়া মহাসুখে উভয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে গবিন্দপুরের নাম “প্রেমময়ী” হইল; রাজসরোবরের নাম “প্রেম-সরোবর” হইল; রাজ উদ্যানের নাম প্রেমোদ্যান হইল; সেই দিন হইতে সুবুদ্ধিকেশরীর সমস্ত রাজ্য প্রেমময় হইল। কালে সকলই গেল; বিশাল রাজবাটীর উপর এক্ষণে গভীর শালবন হইয়াছে।

—

দিলজান বাঁদী।

(১)

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে এক দিন সন্ধ্যার সময় দিল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী কুতবমিনার নামক বিখ্যাত স্তম্ভের নিম্নে বসিয়া একটি বালিকা আকাশের দিকে চাহিয়া তারা গনিতে ছিল। বালিকার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে, বেশ সচরাচর পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রমণীগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ; কিন্তু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বালিকার পিতা মাতার অবস্থা বড় সচ্ছল নহে। বালিকা একাকী বসিয়া তারা গুনিতেছিল, সেই সময়ে নীলাকাশে এক একটী করিয়া তারা ফুটিতেছিল, কোথা হইতে যেন তারাগুলি দেখিতে দেখিতে আকাশের এখানে সেখানে উদিত হইতেছিল, বালিকা একমনে তাহাই দেখিতেছিল।

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটী রাজপুতবেশী যুবক নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ধীরে ধীরে আসিয়া দুই হস্ত দ্বারা বালিকার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। বালিকা চমকিত হইয়া বলিল, "ছাড়্ পোড়ারমুখী।" যুবক বালিকার চক্ষু হইতে হস্ত দূর না করিয়া বলিলেন, "পোড়ারমুখী নই—পোড়ারমুখ।" বালিকার কপোল যুগলে যেন গোলাপফুল ফুটিল, বালিকা সলজ্জভাবে বলিল "ছেড়ে দাও।" যুবক বলিলেন, "আমি কে, না বলিলে ছাড়িব না।" বালিকার লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তিমাভ হইল; বালিকা আবার বলিল, "ছেড়ে দাও।"

যুবক বলিলেন, "তা হচ্ছে না, আমি কে না বলিলে ছাড়িব না।" তখন বালিকা কম্পিত স্বরে কহিল, "কুমার ছেড়ে দাও।" তখন যুবক বালিকার চক্ষু হইতে হস্ত দূর করিয়া দুই হস্তে সেই মনোহর মুখোত্তলনপূর্ব্বক গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "দিল্, গোলাপফুল আমার!"

(২)

এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় যেই আগ্রার প্রাসাদের সিংহদ্বার, উপরস্থ নহবত খানার মধুর বাদ্য বন্ধ হইল, অমনি প্রাসাদে এক মহাগোল উঠিল। সহসা প্রচার হইল যে বাদসাহ আকবর সাহা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাদসাহের পুত্র, পৌত্র, সাহাজাহা সেলিম ও খসরু—উভয়েই সিংহাসন প্রার্থী,—উভয়েরই পক্ষে ওমরাওদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন; সুতরাং বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইলে, প্রথমে রাজপ্রাসাদে, তৎপরে দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগরে, সেই নিশীথ রাত্রিকালে একটা গোল উঠিল। সাহাজাদা খসরু নিদ্রা যাইতেছিলেন; জনৈক খোজা তাঁহাকে এ সম্বাদ দিল। তিনি অনতিবিলম্বে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হইলেন। অন্ধকারে দিল্লীর শত সহস্র প্রকোষ্ঠময়ী প্রাসাদের ঘূর্ণায়মান পথ দিয়া খসরু আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে কে তাঁহার গতিরোধ করিল,—কে তাঁহার হাত ধরিল। খসরু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" তখন স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "সাহাজাদা, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনি এক্ষণে বাহিরে যাইবেন না। সেলিমের চর আপনাকে বন্দি করিবার চেষ্টা করিতেছে।" তাঁহাকে যে

কেহ বন্দি করিতে পারে এ কথা খসরুর বিশ্বাস ছিল না, তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "খসরু আকবরের পৌত্র, মান-সিংহের ভাগিনেয়, খসরুকে বন্দি করে এমন লোক এখনও জন্মায় নাই।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলেন, তখন সেই ঘোর অন্ধকারে সেই রমণী আবার আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল, বলিল, "আপনাকে আমি যাইতে দিতে পারি না, যাইতে দিব না।" খসরুর মনে সন্দেহের উদয় হইল,—তিনি ভাবিলেন হয়তো এই নিশাচরীই সেলিমের চর—তিনি সবলে হস্ত উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন রমণী অতিশয় বল সহকারে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়াছে, তাঁহার অধিকতর সন্দেহ হইল, তিনি সবলে হস্ত উন্মুক্ত করিলেন। রমণী বোধ হইল দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন,—বোধ হয় প্রস্তর প্রাচীরে তাহার মস্তকেও বিশেষ আঘাত লাগিল; কিন্তু খসরু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতে সেই রমণী আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "দেখুন, আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, আমায় মারিয়া ফেলিতে চাহেন মারিয়া ফেলুন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমি কিছুতেই আপনাকে বিপদে যাইতে দিব না।" খসরুর তখন বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি ছিল না,—তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ, পথ ছাড়িয়া দেও।" এই বলিয়া তিনি সবলে পদমুক্ত করিলেন; রমণী বোধ হয় আবার প্রস্তরে আঘাতিত হইলেন।

তখন খসরু দ্রুতবেগে বাহিরে আসিলেন; যেই বাহিরে আসিয়াছেন অমনি প্রাচীর পার্শ্বে লুক্কায়িত প্রায় পঞ্চাশ জন

সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি নিজ অসি উন্মোচনেরও সময় পাইলেন না, তিনি বন্দি হইলেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে লইয়া চলিল,—যাইতে যাইতে খসরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি?" একজন সৈনিক বলিল, "সাহাজাদা, ক্ষমা করিবেন, আমাদের সে হুকুম নাই।" তখন খসরু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই পথে বেগম মহলে এই মাত্র কেহ গিয়াছিল কি?" সেই সৈনিক আবার কহিল, "আর কাহাকেও যাইতে দিবার আমাদের অনুমতি ছিল না। সাহাজাদা সেলিমের বাঁদী দিলজানী গিয়াছিল।" "কি? দিলজান, দিলজান!" অস্পষ্ট স্বরে খসরু দুই তিনবার এই কথা বলিলেন, তৎপরে অন্যমনস্ক হইলেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে কারাগারের দিকে লইয়া চলিল।

(৩)

যে বালিকা কুতবমিনারের নিম্নে বসিয়া তারা গণিতেছিল তাহার নাম কমলকুমারী। লছমন সিংহ নামে এক ব্যক্তির দিল্লীর বাজারে একখানি ক্ষুদ্র কাপড়ের দোকন ছিল; তাহাতে লছমন সিংহ দশটাকা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। কমল এই লছমন সিংহের একমাত্র কন্যা। কমলের বয়স দ্বাদশ বৎসর হইলে লছমন সিংহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; তখন নানা ছলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতে দোকানটী ফাঁকি দিয়া লইল, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার যাহা কিছু ছিল তাহাও তাহারা লইল। কমলের মাতা নিজ কন্যাকে লইয়া মহা কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার দরিদ্রতা দেখিয়া তাঁহার

রূপবতী কন্যার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়িল। তিনি এই সকল দেখিয়া ভীতা হইয়া দিল্লী ত্যাগ করত দিল্লী হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুতবমিনারের নিকট আসিয়া কন্যাকে লইয়া এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। মাতা ও কন্যা টুপী সেলাই করিয়া যাহা পাইতেন তাঁহাদের তাহাতেই অতি কষ্টে একরূপ চলিত।

স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাস পরেই কমলের মাতার দিল্লী ত্যাগ করিতে হয়; তাঁহারা আরও ছয় মাস কুটীরে বাস করিলেন। এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যা কালে কমল বাজারে টুপী বিক্রয় করিয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, একখানি লোহিত রঙ্গের সাড়ী তাহার পরিধান ছিল। তাহার সাড়ীর রং দেখিয়া পথপার্শ্বস্থ একটী মহিষ অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। কমল প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল, তাহার চীৎকারে মহিষ আরও কুপিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিল, যাহার মহিষ সেও নিকটে ছিল, সেও ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মহিষের নিকট যাইয়া বালিকার প্রাণরক্ষা করিতে কাহারই সাহস হইল না। আর এক মুহূর্ত্ত,—কমলকে মহিষ প্রায় ধরিয়াছে আর কি, এখনই তাহাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিবে, এমন সময়ে কোথা হইতে একটী তীর আসিয়া সেই কুপিত মহিষের নত মস্তকের উত্তোলিত শৃঙ্গের ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্ধ হইল। নিমিষের মধ্যে মহিষ ধরাশায়ী হইল, আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। কমল চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। তখন সকলে দেখিল যে একটী অতি সুন্দর

আরবীয় অশ্ব বায়ুবেগে ধাবিত করিয়া একটী রাজপুত যোদ্ধা সেই দিকে আসিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সেই স্থানে আসিয়া অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া লম্ফ দিয়া ভূমে অবতরণ করিলেন। তৎপরে একবারে কমলের হাত ধরিয়া বলিলেন, "লাগে নাই তো।" কমল এত মিষ্ট কথা কখন শুনে নাই, সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল। তখন সেই যুবক নিজ পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখানি বহুমূল্যবান রুমাল বাহির করিয়া কমলের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর ভয় কি, চল বাটী রাখিয়া আসি।" তিনি কমলের হাত ধরিয়া চলিলেন; সেই স্থানে যত লোক জমিয়াছিল তাহারা যুবকের বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে কোন রাজপুত রাজকুমার মনে করিয়াছিল; এক্ষণে যাহার মহিষ সে কহিল, "মহারাজ, মহিষটী আমার।" যুবক ফিরিয়া তাহার দিকে দুইটী মোহর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় তোমার মহিষের দাম ইহাপেক্ষা অধিক নহে।" তখন তিনি কমলকে লইয়া চলিলেন। পথে আসিতে আসিতে কেহই কোন কথা কহিলেন না,—কমলের কথা কহিবার ক্ষমতা লোপ হইয়াছিল, তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়াছিল। কুটীরের সম্মুখে আসিয়া কমল কম্পিত স্বরে কহিল, "এই আমাদের বাড়ী।"

যুবক কুটীর দেখিয়া যেন চমকিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। কমলের মাতা কমলের নিকট সকল কথা শুনিয়া যুবকের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবক বলিলেন,

"মাতঃ! আমি অধিক আর কি করিয়াছি,—সম্মুখে নারীহত্যা হয়, সেই নারীজীবন রক্ষা করিবার জন্য তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; কোন্ রাজপুত না ইহা করিত?" যুবক ইচ্ছা করিয়া সেই কুটীরে বসিলেন, তৎপরে কমলের মাতার অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার নিকট হইতে কথায় কথায় তাঁহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল জানিয়া লইলেন। তৎপরে "আবার আসিব" বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন।

(৪)

'কমল জানিনা কেন অস্থির হইল; পর দিন সে সমস্ত দিনই যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কাহারও আসার শব্দ হইলে সে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল, তিনি আসিলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন বৃদ্ধ মুসলমান চারিজন হিন্দুবাহকের দ্বারা নানা প্রকার আহারীয় ও বস্ত্রাদি আনিয়া কমলদের কুটীরে উপস্থিত করিল। কমলের মাতা কত বারণ করিলেন, কমল কত বারণ করিল, তাহারা সে কথায় কর্ণপাতও করিল না,—সমস্ত তাহাদের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল। তখন কমলের মাতা কমলকে বলিলেন, "যিনি কাল তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তিনিই তোমাকে এ সকল পাঠাইয়াছেন। আমাদের অবস্থা ভিক্ষুকের অধম হইয়াছে। আর দান গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া লাভ কি? এমন সদাশয় লোকের দান গ্রহণ বরং ভাল।" তখন কমল আরও অস্থির হইল; পর দিবস তাহার কাজ কর্ম্ম করা কঠিন হইয়া উঠিল; সে তাহার হৃদয়ের ভাব অত্যন্ত কষ্টে গোপন করিতে লাগিল। কিন্তু যাহার জন্য সে এত অস্থির হইল তিনি আসিলেন না। প্রতিদিন

সন্ধ্যার সময় বাহকেরা আহারাদি লইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজপুত যুবক আর আসিলেন না। একদিন কমল মুখ ফুটিয়া বাহকদিগকে রাজপুত যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তো প্রথমে কোন কথাই কহিবে না, অবশেষে অনেক কাকতি মিনতিতে বলিল, "আমরা কোন রাজপুত যুবককে চিনি না, তাঁহার আজ্ঞায়ও এ সকল আনিতেছি না।" তখন কমল হতাশ হইল; এইরূপে তিনমাস কাটিয়া গেল।

তিনমাস পরে সহসা একদিন রাজপুত যুবক দেখা দিলেন। কমলের বিষণ্ণ বদনে হাস্যের উদ্রেক হইল। কমলের মা তাঁহাকে প্রথমেই এরূপে আহারাদি পাঠাইতে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন "কে পাঠায়, সে আমিতো নই, যদি, তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় বারণ করিব।" তৎপরে কমলের মাতা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যুবক বলিলেন, "আমি সামান্য রাজপুত মাত্র, নাম কুমার সিংহ, মহারাজা মানসিংহের সহিত কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।"

সেই দিবস হইতে রাজপুত যুবক প্রত্যহ কোন না কোন সময়ে কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই সাক্ষাৎ দৃশ্যের একটী চিত্র আমরা প্রথমেই অঙ্কিত করিয়াছি।

কমলের মাতা ইহা জানিতেন, তবে ইহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না। যাহার এরূপ সদাশয় ও মহৎ অন্তকরণ তাহার উপর তিনি কোনই সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সময় পাইলেই যুবক বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। রাজপুত রাজকুমারের সহিত কমলের বিবাহ হউক ইহাপেক্ষা

আর অধিক আশা কে কি করিতে পারে? এইরূপে একবৎসর কাটিয়া গেল, যুবক প্রত্যহই আসিতে লাগিলেন, আহারীয় দ্রব্যাদিও প্রত্যহ আসিতে লাগিল। কমল বড় সুখেই একবৎসর কাটাইল।

(৫)

সহসা একদিন রাজপুত যুবক অনুপস্থিত হইলেন;—যিনি প্রতিদিন আসিতেন, ঝড় বৃষ্টি মানিতেন না, তিনি সহসা অনুপস্থিত হইলে কাহার না ভাবনা হয়। কমল নানা প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল; বহু কষ্টে সে রাত্রি কাটাইল, কিন্তু পর দিনও কুমার সিংহ আসিলেন না, পর দিনও আসিলেন না, তার পর দিনও আসিলেন না। কমলের অবস্থা বর্ণন করিতে যাওয়া বৃথা; কমলের মূর্ত্তি দেখিয়া কমলের মাতা নির্জ্জনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুত যুবক আসিলেন না। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল; কমল ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তাহার মুখে দুঃখের মেঘ গাঢ়তর রূপে অধিষ্টিত হইল। কিন্তু কুমার সিংহ আসিলেন না। এই এক বৎসর প্রত্যহই নিয়ম মত আহারাদি আসিত, কিন্তু সহসা তাহাও একদিন বন্ধ হইল। তখন কমলের মাতার যুবকের উপর বড়ই ক্রোধ হইতে লাগিল, তিনি যুবককে গালাগালি দিতে লাগিলেন। কমল কেবল এই মাত্র বলিল, "তিনি ইহা ইচ্ছা করিয়া কখনই করেন নাই।" ক্রমে আবার কমলদের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল, কমলের মাতা এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না, পীড়িতা হইলেন। তখন কমল দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, অবশেষে

দেখিল যে আর অন্নের চেষ্টা না করিলে চলে না, পথ্যাভাবে চক্ষের উপর মাতার প্রাণনাশ হয়, তখন সে একদিন হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া দিল্লীর দিকে চলিল,—ভাবিল একটা চাকরীর চেষ্টা করিবে, আর পারেতো কুমার সিংহেরও সংবাদ লইবে। মাতাকে "বাজারে যাইতেছি" বলিয়া সে একদিন প্রাতে পদব্রজে দিল্লী চলিল।

সহরের গতিক তাহার বোধ ছিল না;—সহরে আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে দেখিতে দেখিতে পথ ভুলিয়া গেল। কত জন কতরূপে তাহাকে অপমানিত করিতে লাগিল; সে তখন বাটী প্রত্যাগমনে হতাশ হইল, সমস্তদিনের অনাহারে ব্যাকুল হইয়া কমল এক মসজিদের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই পথে একজন বৃদ্ধ মোগল যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—তৎপরে বলিলেন "কমল কুমারী?" কমল চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তৎপরে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?" কমল তখন মোগলকে চিনিল, ইনিই প্রথম দিবস তাহাদের কুটীরে আহারাদি লইয়া গিয়াছিলেন। সে কিছুই অধিক বলিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বাড়ী যাইব, পথ ভুলিয়া গিয়াছি।" তখন মোগল বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।" কমল কুমারীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মোগলের দয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আরও দয়া হইল। তিনি বলিলেন "সে যুবক কি আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেন না?—আহারাদিও কি বন্ধ হইয়াছে?" এবার কমল

একেবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন মোগল পথে আসিতে আসিতে তাহার নিকট একে একে সমস্ত কথা শুনিলেন; কমল চাকরীর প্রত্যাশায় যে দিল্লী আসিয়াছিল তাহাও শুনিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্য একটী চাকরী জোগাড় করিয়া দিতে পারি,—কিন্তু মুসলমানের বাড়ী চাকরী করিবে কিনা জানি না।" কমলের চক্ষে তখন মাতার অনাহার নাচিতেছিল, তখন তাহার আর অন্য স্থান ছিল না, সে বলিল "করিব।" মোগল বলিলেন, "তবে কাল প্রস্তুত থাকিও, আমি কাল প্রাতে যাইয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। চাকরী আগ্রায়, বেগম মহলে। মাকেও সঙ্গে নিও। বোধ হয় সেখানে সুখে থাকিতে পারিবে।" এই সময়ে তাঁহারা প্রায় সহরের বাহিরে আসিয়াছিলেন, বৃদ্ধ মোগল কতকগুলি আহারীয় ক্রয় করিয়া কমলকে প্রদান করিতে উদ্যত হওয়ায় কমল সঙ্কুচিত হইল। মোগল বুঝিলেন, বলিলেন, "সঙ্কুচিত হইও না, ইহা তোমার মাহিয়ানার অগ্রিম স্বরূপ গ্রহণ কর।" তখন কমল সেই গুলি লইয়া দ্রুতপদে গৃহের দিকে চলিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

(৬)

কমল বাটী আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিল; তিনি প্রথমে কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। একে চাকরী, তাহা আবার মুসলমান গৃহে, কমলের মাতার পক্ষে ইহা একরূপ অসহ্য হইল। কিন্তু কমল অনেক বুঝাইতে লাগিল; তাহার কাকুতি মিনতিতে কমলের মাতা অবশেষে স্বীকৃতা হইলেন। মাতার কষ্ট কমলের পক্ষে সহ্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়া

ছিল,—তাহার উপর তাহার আর সে স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা একবিন্দুও ছিল না; কুমারসিংহের সহিত ঐ স্থানে কত বেড়াইয়াছি, ঐ স্থানে বসিয়া কত কথা কহিয়াছি,—প্রতি পদেই কুমারসিংহের কথা মনে পড়ে, কমলের কোমল প্রাণে এ অসহ্য হইয়াছিল। তাহাই সে বাসস্থান ত্যাগ করিতে এতই ব্যাকুলা। সে ভাবিয়াছিল, অন্যত্র যাইয়া দাসী বৃত্তি করিয়া একরূপে মাতার কষ্টও নিবারণ করিতে পারিবে, অথচ কুমার সিংহের কথাও আর এত মনে পড়িবে না। এই সকল ভাবিয়াই কমল আগ্রায় যাইয়া চাকরী করিতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল; ও এত কষ্ট করিয়া মাতাকে রাজি করিল। তাহাদের যাহা কিছু ছিল, কমল রাত্রিতে সকল বাঁধিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। সকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একখানি বইল গাড়ী লইয়া মোগল আসিলেন; কমল ও কমলের মাতা তাহাতে আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধ মোগল একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহারা আগ্রায় পৌঁছিলেন। সে রাত্রে আর মোগল কমলকে বেগম মহলে লইয়া গেলেন না। নগরের প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীর স্থির করিয়া তথায় কমল ও কমলের মাতাকে রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এই কুটীর যমুনার ধারে, বেগম মহলের একটী গুপ্তদ্বারের অতি সন্নিকটবর্ত্তী। পরদিবস প্রাতে আসিয়া মোগল কমলকে লইয়া চলিলেন। বেগম মহলের দ্বারে আসিয়া একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মলক্ এখন কোথা?" প্রহরী কহিল "খোজা সাহেব ঐ খানে আছেন।" তখন মোগল কমলকে লইয়া খোজার নিকট আসিলেন। বেগম মহলের তত্ত্বাবধানের

তার ইহঁার উপর ছিল। মোগলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এই বালিকা?" মোগল কহিলেন, "যাহার কথা বলিয়াছিলাম; কোন্ বেগম সাহেবের নিকট রাখিবে?" খোজা কহিলেন, "সাহাজাদা সেলিমের দিলখোস বেগমের নিকট।" মোগল বলিলেন, "ভালই হইল; তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্র আছে।"

তখন খোজার সহিত কমল চলিল; কত পথ, বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর কত দ্রব্য,—আগ্রার বেগম মহল কবি কল্পনা প্রসূত ইন্দ্রপুরি অপেক্ষাও মনোহর ছিল; কমল বিমুগ্ধ চিত্তে এই সকল দেখিতে দেখিতে এক অতি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মখমল গদিযুক্ত হস্তি দন্ত নির্ম্মিত পালঙ্ক উপরে দিলখোস বেগম অর্দ্ধ শয়ন করিয়া কি পাঠ করিতেছিলেন। খোজা প্রবেশ করিয়া ভূমি চুম্বন করিয়া বলিল, "বেগম সাহেব, বাঁদী উপস্থিত হইয়াছে।" বেগম সাহেব কমলের দিকে চাহিয়া খোজাকে প্রস্থান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, খোজা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। তখন বেগম দিলখোস বলিলেন, "বোস, বোস—তোমার বয়সতো বড় অল্প।" বেগমের বয়সও কমলের অপেক্ষা বড় অধিক ছিল না।

তখন বেগম সাহেব একে একে কমলের সকল কথা শুনিলেন,—কমল সকল বলিল কেবল কুমার সিংহের কথা বলিল না। তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া বেগমের মনে বড়ই কষ্ট হইল, কমলের সহিত তাঁহার সমান বয়স হওয়ায় সহানুভূতি আরও গাঢ় হইল। কমল প্রার্থনা করায় তিনি কমলকে প্রত্যহ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য

অনুমতি প্রদান করিলেন। অবশেষে বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন-“তোমার নামটী কি ?” কমল বলিল, “আমার নাম কমল, কিন্তু এখানে আর সে নামে কাজ কি ?” বেগম সাহেব বলিলেন, “কেন, কেন ? তোমার ধর্ম্মের উপর হাত দেয় কাহার সাধ্য। জানইতো বাদসাহ স্বয়ং হিন্দুর মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন।” কমল বলিল, “না—তা নয়—তবে কাজ কি।” বেগম বলিলেন, “তোমার আপত্তি থাকেতো কেন তোমায় ও নামে ডাকিব ; তবে কি বলিয়া তোমায় ডাকিব ?” কমল একটু ভাবিল, তৎপরে বলিল, “আমাকে দিলজান বলিয়া ডাকিবেন।” কুমারসিংহ প্রায়ই কমলকে আদর করিয়া দিল্ বলিতেন।

এইরূপে বাঁদী হইয়া কমল ছয় মাস কাটাইল। প্রত্যহ দুই প্রহরের সময় সে যাইয়া মাতার আহারাদি রন্ধন করিয়া দিয়া আসিত। তাহারা একরূপ সুখে দুঃখে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল।

(৭)

একদিন কমল বৈকালে মাতাকে আহারাদি করাইয়া বেগম মহলে আসিতে ছিল, পথি মধ্যে আসিয়া দেখিল যে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সহ বাদ্যোদম করিয়া কে আসিতেছেন। সে সেই জনতার মধ্যে দিয়া যাওয়া অসম্ভব বুঝিয়া এক দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন সর্ব্ব প্রথমে পাঁচ সাত জন নকিব ফুকরাইতে ফুকরাইতে আসিল, তৎপশ্চাতে একদল বাদ্যকর, তৎপশ্চাতে প্রায় একশত সুসজ্জিত হস্তী পৃষ্ঠে একদল সৈন্য, তৎপশ্চাতে অসংখ্য কামান, তৎপশ্চাতে অসংখ্য পদাতিক সৈন্য, তৎপশ্চাতে প্রায় দশহাজার অশ্বারোহী,

ইহাদের পশ্চাতে প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিক পুরুষে বেষ্টিত হইয়া একজন মুসলমান যোদ্ধা একটী সুন্দর অশ্ব পৃষ্ঠে সদর্পে আসিতেছেন। কমল এই সকল দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সে মুসলমান যোদ্ধাকেও দেখিল, তৎপরে সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল; সে পড়িতেছিল, কিন্তু দোকান প্রাচীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যে অসংখ্য সৈন্য গেল সে আর তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। সে মুসলমান বেশে দেখিল—কুমারসিংহ। প্রথমে তাহার অবিশ্বাস হইয়াছিল; কুমারসিংহ রাজবংশ সম্ভূত বটে, কিন্তু রাজা নহেন; তাঁহার এত জাক জমক কোথা হইতে হইবে। এত জাক জমক সাহাজাদাগণেরই হইতে পারে; সে এই সকল ভাবিয়া প্রথমে ভাবিল যে তাহার ভুল হইতেছে; কিন্তু দুই তিনবার দেখিল তাহার সে সংশয় দূর হইল; তৎপরে আর তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল তখন সৈন্য সামন্ত সকল চলিয়া গিয়াছে, কেবল আগ্রার জনতাপূর্ণ পথে অসংখ্য লোক যে যাহার কার্য্যে চলিয়াছে। সে দেখিল সন্ধ্যা হয়, তখন সে দ্রুতপদে বেগম মহলের দিকে চলিল। কিছুদূর আসিয়া তাহার আর একটী বাঁদীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; কমল বহুকষ্টে মুখ ফুটিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই পথে এই মাত্র কে গেলেন জান?" বাঁদী যেন চমকিত হইল, বলিল, "এ্যা! তুমি কি সাহাজাদা খসরুকে চিন না? হয়তো উনিই বাদসা হবেন, খসরু রাজা মানসিংহের ভাগ্নে। কি আশ্চর্য্য, তুমি সাহাজাদা খসরুকে চিন না!" কমলের সর্ব্ব শরীর কম্পিত

হইল, কমল চারিদিকে অন্ধকার দেখিল তৎপরে সেই রাজ-পথে মুর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইল। তখন দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে একটা জনতা হইল। বাঁদী একখানা গাড়ী জোগাড় করিয়া কমলকে বেগম মহলে লইয়া গেল।

বেগম মহলে আসিয়া কমলের মুর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; সে বলিল, "তাহার এইরূপ মুর্চ্ছা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।" তৎপরে সে সেইরাত্রে অসুস্থ বোধ করায় মাতার নিকট গেল। তথায় যাইতে না যাইতে পথিমধ্যেই সে ভয়ানক জ্বরাক্রান্তা হইল। বেগম সাহেব কমলকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া তাহার তত্ত্ব লইতে লাগিলেন ও তাহার চিকিৎসার জন্য এক জন হাকিম পাঠাইলেন, একজন দাসীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। একমাস জ্বরে ভুগিয়া কমল উঠিতে সক্ষম হইল। তখন সে বেগম সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল, কিন্তু বলিল, "বেগম সাহেব, দাসী আপনার দয়া, স্নেহ ও ভালবাসা কখনই ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ দাসী আর আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারিতেছে না।" বেগম অনেক অনুরোধ করায়ও, কমল কারণ বলিল না, থাকিতেও স্বীকৃত হইল না। তখন বেগম সাহেব তাহাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বলিলেন, "যদি নিতান্তই যাইবে তবে আজিকার রাত্রি থাকিয়া যাও।" কমল এ অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, সে রাত্রি বেগম সাহেবের নিকট থাকিতে স্বীকৃতা হইল।

রাত্রি কালে কমল বেগমের নিকট শুনিল যে সেলিম খসরুকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন এই

কথা শুনিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। তাহার কুমারসিংহই খসরু, আকবরের পৌত্র, এ কথা ভাবিতেও তাহার হৃদয় বসিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যে তাহাদিগকে অনাহার হইতে রক্ষা করিয়াছে, যে তাহাদিগকে এত ভাল বাসিয়াছে, যে তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহার আসন্ন বিপদ জানিতে পারিয়াও তাহাকে সম্বাদ না দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে পর দিবস বেগম সাহেবকে বলিল যে সে এখন আর যাইবে না। সে ইচ্ছা সে এখন ত্যাগ করিয়াছে। বেগম মহা সন্তুষ্ট হইলেন, ও সেই আমোদে আর তাহাকে তাহার এই সহসা ইচ্ছা পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তৎপরে সে শুনিল যে খসরুকে বন্দি করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছে,—রজনীতে খসরুকে বন্দিকরা হইবে। নানা সুযোগ অনুসন্ধান করিয়াও সে খসরুকে এই সকল জ্ঞাত করিবার কোন সুবিধা পাইল না; সে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার বিষয়ে প্রায় হতাশ হইল। এমন সময়ে এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইল। কমল শুনিল যে খসরুর বহির্গত হইবার পথে সেলিম গুপ্ত ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছেন; বাদসাহের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই খসরু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বহির্গত হইবেন, অমনি তাঁহাকে বন্দি করা হইবে। আর লজ্জা বা দ্বিধা করিলে চলে না। সেই নিশীথ রাত্রে উঠিয়া সে একাকিনী খসরুর মহলের দিকে চলিল। পথে একজন সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" কমল বলিল "দিলজান বাঁদী, দিলখোষ বেগম সাহেবের নকরী।" সৈনিক পথ ছাড়িয়া দিল।

পরে অন্ধকারে দিলজান খসরুকে যে যাইতে প্রতিবন্ধক দিয়াছিল পাঠক তাহা অবগত আছেন।

(৮)

দিলজানি নিষ্ফল মনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিল; তৎপরে খসরুর বন্দি হইবার সংবাদ পাইল। তখন সে অতি কষ্টে সে রাত্রি বেগম মহলে কাটাইয়া পর দিবস মাতার নিকট আসিল। আসিয়া দেখিল যে মাতার ভয়ানক জ্বর;—সে চিকিৎসক আনাইবার সময় পাইল না। তাঁহার মুমুর্ষাবস্থা উপস্থিত হইল। তিনি সেই মৃত্যু শয্যায় কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "কমল, সব করিস্, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত হইয়া যেন আমার জল গণ্ডুষ বন্ধ করিস্ নে।" এই কথা শুনিয়া কমলের হৃদয় কম্পিত হইল; সে ভাবিল, "মা কি আমার কুমার সিংহের বৃত্তান্ত সব জানিতে পারিয়াছেন!" কিন্তু তাহার আর অধিক ভাবিবার সময় হইল না। কমলের মাতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন কমল কাঁদিতে কাঁদিতে বহু কষ্টে মাতার সৎকারাদি করিল।

এদিকে খসরু নির্জ্জন কারাগারে বন্দি হইয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার মনে যে রমণী তাঁহাকে আসিতে প্রতিবন্ধক দিয়াছিল, তাহারই কথা উদয় হইতে লাগিল; যত তাহার বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে কোথায় যেন তিনি সে স্বর শুনিয়াছেন,—কিন্তু কোথায় শুনিয়াছেন, কিরূপ অবস্থায় শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দিলজান-বাঁদী কে?—সে তাঁহার জন্য এত করিল কেন? তাঁহার জন্য

এত করিতে পারে এরূপ কেবল একজন আছে, কিন্তু সে হিন্দু নার এ মুসলমান, আর সেই বা কিরূপে বেগম মহলে আসিবে? এই সকল বিষয় তিনি যত ভাবেন তাঁহার মন ততই অধীর হয়; শেষ তাঁহার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান না করিয়া থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি কারাধ্যক্ষকে নিজ হীরক হার প্রদান করিয়া তাহাকে দিলজান বাঁদীর সবিশেষ জানিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি কয়েক দিন পরে আসিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা সেলিমের দিলখোস বেগম সাহেবের নিকট দিলজান বলিয়া একজন বাঁদী ছিল; কয়েক দিন হইল তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই জন্য সে বিদায় লইয়া গিয়াছে। তাহারা বেগম মহলের পশ্চিমদিকে যমুনা তীরে একখানি কুটীরে বাস করে।" খসরু এই মাত্র জানিতে পারিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা মানসিংহের ইচ্ছা নিজ ভাগিনেয় খসরু বাদসাহ হয়েন; তাঁহার যত্ন ও সাবধানতাকে পরাস্ত করিয়া সেলিম খসরুকে কারারুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনি এই ঘটনার 'পর নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। তিনি অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া নানা উপায়ে খসরুকে কারামুক্ত করিলেন; তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াই তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র উদয়পুরে পলায়ন কর, এ দিকে যোগাড় হইলে তোমাকে সংবাদ দিব।" খসরু রাত্রিকালে কারামুক্ত হইলেন কিন্তু উদয়পুরে পলায়ন করিলেন না।

(৯)

খসরু প্রায়ই রাজপুত বেশে দিল্লীর নিকটস্থ নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন। নানা স্থানে নানা নাম গ্রহণ করিয়া

নানা লোকের উপকার করিতেন। ইহা তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন আর কেহই জানিত না। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ভ্রমণেই একদিন তিনি বালিকা কমলকে মত্ত মহিষ শৃঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার একজন বিশ্বস্ত মোগল অনুচরকে কমলদের বাটীতে আহারীয় পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপর দিবস কমলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। সেই রাত্রিতেই বাদসাহের আজ্ঞায় একদল সৈন্য লইয়া দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার তিন মাস হইল; তাহাই তিনি তিন মাস আর কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি প্রত্যাগমন করিলে বাদসাহ আগ্রায় যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাকে দিল্লী থাকিবার জন্যই আজ্ঞা হইল। তিনিও তাহাই চাহেন, তিনি তৎপরে এক বৎসর যে দিল্লী বাস করিয়াছিলেন ও প্রত্যহ কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

সহসা এক দিন রাত্রে বাদসার নিকট হইতে লোক আসিল, তিনি সেই লোকের সহিত সেই রাত্রিতেই আগ্রা যাত্রা করিলেন, তথা হইতে তিনি বাদসাহের আজ্ঞায় কাশ্মীর যাত্রা করিলেন; কমলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ও সুবিধা পাইলেন না; কিন্তু যাইবার সময় কমলদের আহারীয় ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। তিনি এক বৎসরের মধ্যে আর কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি বশতঃ লোকেরা কমলদের আহারীয় আনিতে অবহেলা করিতে

লাগিল, তৎপরে একেবারে বন্ধ করিল। তৎপরে যাহা যাহা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এক বৎসর পরে যুদ্ধ জয় করিয়া খসরু যে দিবস আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন সেই দিন পথে কমল তাঁহাকে দেখিতে পায়।

আগ্রায় আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খসরু সেই দিবসই দিল্লী প্রস্থান করিলেন; দিল্লী আসিয়াই তিনি কমলের সন্ধানে গেলেন। কিন্তু যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তিনি দেখিলেন যে কমল আর তথায় নাই। অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেন না, তবে কেহ কেহ বলিল যে "শুনিয়াছি তাহারা আগ্রায় গিয়াছে।" খসরু কমলের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনই সংবাদ পাইলেন না, তখন তিনি হতাশ হইলেন। তৎপরে তাঁহার দিল্লী থাকা কষ্টকর হইল,—তাঁহার মন বড়ই খারাপ হইল। তিনি দিল্লীবাস ত্যাগ করিয়া আগ্রায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বন্দি হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন সেই নির্জ্জনে কমলের কথা তাঁহার আরও অধিক মনে হইতে লাগিল। ইহার সহিত দিলজানীর কথা হৃদয়ে উদিত হওয়ায় তাঁহার মন অধিকতর অস্থির হইয়া পড়িল।

(১০)

মাতার শ্রাদ্ধাদি যথা সাধ্য সম্পন্ন করিয়া কমল সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার মনস্থ করিল; তাহার যাহা কিছু ছিল সে বিক্রয় করিল, গেরুয়া বসন ও কমণ্ডলু সংস্থান করিল; তৎপরে এক দিন অতি প্রত্যুষে বাটী হইতে বহির্গত হইল। দ্বার হইতে

বহির্গত হইয়া সম্মুখে দেখিল—কুমারসিংহ। তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সে পড়িবার উপক্রম করিল, তখন খসরু তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কমল সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সাহাজাদা দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি খসরু অগ্রে এ কথা আমাকে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে দুঃখিনীর কন্যা আপনার ন্যায় লোককে কখন ভাল বাসিত না,—ভয়ে দূরে থাকিত।" খসরু বলিলেন "আমার অধিক কথা কহিবার সময় নাই; আমার পশ্চাতে শত্রু। কমল, বল, বল, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে কিনা? তোমার কথার উপর আমার জীবনের সুখ দুঃখ আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। রাজ্য সিংহাসন আমি কিছুই চাহি না; তোমাকে লইয়া জঙ্গলে থাকিলেও আমি সুখে থাকিতে পারিব; বল বল, দিল্লীর সিংহাসন তো আমার।" কমল ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরস্বরে বলিল, "আপনি কেন কুমারসিংহ হইলেন না, আপনি কেন আমার নিকট আত্মগোপন করিলেন?" খসরু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কমল, আমাকে ক্ষমা কর, অত কথা কহিবার আমার তো সময় নাই: কমল, বল, বল, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারে কিনা?" তখন কমল কহিল, "কুমার, ভালবাসার দ্রব্য পাইব, দিল্লীর বাদসাহের সহধর্ম্মিনী হইব, এ প্রলোভন বড়ই প্রলোভন। কিন্তু কুমার, তুমি কি আমাকে তোমায় বিবাহ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়া মাতার জল গণ্ডূষ বন্ধ করিতে বল? মাতাকে অনাহারে রাখিয়া তুমি কি আমাকে রাজ্য সুখভোগ করিতে বল? আমি যে তোমাকে বিবাহ করিলে আর মাতাকে জল গণ্ডূষ দিতে পারিব না, তুমি

কি আমাকে মাতাকে অনাহারে রাখিয়া বিলাস ভোগে দিল্লীর বাদসাহের মহিষী হইতে বল?” খসরু সেই স্থানে জানু পাতিয়া বসিলেন, বলিলেন, “তুমি দেবী, তোমায় পাইব এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি। আর তোমাকে না পাইয়া আমার রাজ্য সিংহাসন সব মিথ্যা। কমল, কমল, ইহজন্মে হইল না, দেখি পরজন্মে তোমাকে পাই কি না।” তৎপরে তিনি বেগে উত্থান করিলেন, আর কমলের দিকে চাহিলেন না, যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিলেন, “একটী প্রার্থনা, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে একবার দেখা দিও, আমায় গোয়ালিয়রের কারাগারে পাইবে।” খসরু উদয়পুর পলাইলেন না, তিনি মানসিংহের কথা শুনিলেন না, তিনি সেলিমের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল; তিনি গোয়ালিয়রের কারাগারে বন্দি হইলেন।

আমাদের আর কিছুই অধিক বলিতে নাই; কমল সন্ন্যাসিনী হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলেন। খসরু প্রায় দশ বৎসর গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দি রহিলেন, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। সকলেই অবগত আছেন যে, যে দিবস হন্তাগণ জীর্ণ শীর্ণ খসরুকে হত্যা করিতে উদ্যত হয় সেই সময়ে সেই খড়্গের নিম্নে একটী রমণী সহসা কোথা হইতে আসিয়া নিজ দেহ নিক্ষিপ্ত করেন। আহত, রক্তাক্ত কলেবর খসরু এক জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনীকে নিজ দেহোপরি আহত পতিত দেখিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, “দেবী, আপনি কে?” তখন আসন্ন-মৃত্যু সন্ন্যাসিনী বলিলেন, “কুমার, আজ আমাদের বিবাহ।”

যাও, যাও, কমল, এরূপ বিবাহের ফুলসজ্জা স্বর্গে হইবে না তো আর কোথায় হইবে ?

প্রহরীর কন্যা।

(১)

যে যশোহরে মহারাজা প্রতাপাদিত্য রাজত্ব করিতেন, সেই যশোহর নগরের উপর এক্ষণে নিবিড় অরণ্য হইয়াছে, তথায় এক্ষণে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ বাস করিতেছে, তথায় এক্ষণে দিনেও কেহ সাহস করিয়া যায় না। কয়েক বৎসর হইল আমি যশোহর নগর দেখিতে গমন করি, প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত কালী যশোহরেশ্বরী নামে এখনও বিরাজিতা রহিয়াছেন, কেহ কেহ ইঁহার পূজার্থে এই স্থানে যাইয়া থাকে। এক ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই কালীর মন্দিরের নিকট জঙ্গলের বহির্ভাগে ভৈরব নদের তীরে বাস করেন। এই পরিবারের কর্ত্তা এক ব্রাহ্মণই এক্ষণে বিখ্যাতা যশোহরেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। রাত্রি যাপনের অন্য কোন সুবিধা না হওয়ায় আমাকে অগত্যা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটী আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। আহারের সময় কথায় কথায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বিবাহ হইয়াছে?" আমি "হ্যাঁ" বলিলে তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি মুরলার মত একটী কন্যা হউক।" আমি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আশ্চর্য্যাম্বিত হইলাম, বলিলাম, "কেহ কাহাকেও কন্যা হইবার আশীর্ব্বাদ করিতে শুনি নাই, আপনি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, আপনি যে মুরলার নাম করিলেন নিশ্চয়ই তিনি মহৎ হইবেন, ইনি কে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন

"শুনন।" তৎপরে তিনি যাহা বলিলেন এক্ষণে ·,
আমি তাহাই বলিব।

(২)

যখন পাঠানদিগের শেষ অধিপতি দাউদ খাঁ মোগল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন, যখন তিনি দেখিলেন তিনি প্রতি পদেই পরাস্ত হইতেছেন, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন্ত্রি শ্রীহরির নূতন প্রতিষ্ঠিত নগরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ধনের সাথে সাথে তাঁহার রাজধানী ত্যাগ করিয়া অসংখ্য লোকও এই নূতন নগরে আসিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বিখ্যাত মোগলমারির যুদ্ধে দাউদ খাঁ বঙ্গ সিংহাসন হারাইলেন, ওদিকে এই নূতন যশোহর নগরী ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া গৌরবময়ী হইয়া দাঁড়াইল। দাউদের লীলা শেষ হইলে, শ্রীহরি রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ভাবে যশোহর নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য মহা পরাক্রান্ত হইয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তৃত করিলেন; দিল্লীর বাদসাহকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রবল পরাক্রমে তিনি প্রায় বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নিজ করকবলিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যখন তিনি এইরূপে মহা ধূম ধামে যশোহর নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ের একটী ঘটনার বিষয় আমরা উল্লেখ করিতে যাইতেছি।

এই সময়ে রঘুনাথ বলিয়া এক ব্যক্তি রাজ প্রাসাদে প্রহরীর কার্য্য করিত। রঘুনাথকে সকলেই একজন বড় "খেলোয়াড়' বলিয়া জানিত। রঘুনাথের সাহস ও বল দেখিয়া মহারাজা

ও বুঝিয়াছিলেন যে, সময়ে রঘুনাথ অনেক কার্য্য ...ত পারিবে। রঘুনাথের বাল্যকালে বিবাহ হয়; স্ত্রী একটী তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন; এক্ষণে রঘুনাথের সেই কন্যাটী মাত্রই সংসারের সম্বল; রঘুনাথের এ সংসারে আর কেহ ছিল না। এই কন্যার নাম মুরলা। রঘুনাথ কন্যার মুখ দেখিয়া অন্য সকলকেই ভুলিয়া গিয়াছিল, কন্যার ভালবাসায় সে যত সুখভোগ করিত, দিল্লীর বাদসাহ বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া তত সুখ বোধ করিতেন কিনা সন্দেহ।

মুরলার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর সেই সময়ে রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিলেন। যশোহর নগরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রান্তরে বাদসাহের সৈন্যে ও বাঙ্গালী সৈন্যে ঘোর যুদ্ধ হইল। প্রতাপাদিত্য হারিয়া বন্দি হইলেন; রাজা মানসিংহ যুদ্ধ জয় করিয়া মহানন্দে দিল্লীর দিকে চলিলেন; তিনি প্রতাপাদিত্যকে বন্দি করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। জুলফকির খাঁ নামে একজন মোগল সেনাপতি যশোহরের শাসন ভার পাইলেন। তিনি প্রথমেই যে সকল ব্যক্তি বাদসাহ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, অথচ এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে বন্দি করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ড করিলেন, কাহাকেও বা বন্দি রাখিলেন। রঘুনাথ কারারুদ্ধ হইল। মুরলা পিতৃহারা হইয়া প্রথমে পাগলিনীর ন্যায় হইল; কিন্তু ক্রমে সে অনেক স্থির হইল। পিতাকে কারামুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। সে প্রতিদিন একবার করিয়া পিতার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত, তাহাতেই তাহার কষ্ট অনেক কমিয়াছিল। একদিন সে কারাধ্যক্ষের পা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিতে লাগিল, তিনি তাহার দুঃখে একটু বিচলিত হইলেন, বলিলেন, "আমার সাধ্য কি যে আমি তোমার পিতাকে মুক্তিদান করি, ক্ষমতা থাকিলে এখনি করিতাম। সুবাদার যেরূপ লোক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বৃথা হইবে। বাদসাহ ভিন্ন আর কেহই তোমার পিতাকে মুক্তিদান করিতে পারেন না।" মুরলা চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তৎপর দিন রঘুনাথ সমস্ত দিন কন্যার প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু কন্যা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না। পরদিনও আসিল না, এইরূপে একমাস কাটিয়া-গেল, তবুও আসিল না। তখন রঘুনাথ কন্যার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রায় চক্ষু নষ্ট করিবার উপক্রম করিলেন।

(৩)

একদিন দুই প্রহরের সময় একটী বালিকা যে পথ বঙ্গদেশ হইতে বরাবর পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথের ধারে একটী বট বৃক্ষের নিম্নে শায়িতা ছিল। বালিকা বোধ হয় তিনি চারি দিবস আহারাদি করে নাই,—তাহার আকৃতি দেখিয়া তাহার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই সময়ে সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে একটী যুবক যাইতেছিলেন তিনিও খরতর রৌদ্রে আর অধিক অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সেই বৃক্ষ তলে বিশ্রাম করিতে আসিলেন। তিনি বালিকাকে দেখিবা মাত্র সত্বর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হই-লেন ও বালিকার নিকট আসিয়া তাহার গায় হাত দিয়া দেখি-

লেন। তাঁহার হস্তস্পর্শানুভব করিয়া বালিকা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল "বাদসা, ক্ষমা।" যুবক দেখিলেন বালিকাকে সত্বর কোনরূপ চিকিৎসাধীন না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। তিনি সেই স্থানে অশ্বকে বন্ধন করিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া নিকটস্থ জনৈক কৃষকের আবাসের দিকে ধাবিত হইলেন; তথায় আসিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ লইয়া তিনি বালিকাকে সেবন করাইলেন। তৎপরে বহুক্ষণ ধরিয়া যত্ন করায় বালিকার সংজ্ঞা হইল, কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না; তাহার ভয়ানক জ্বর আসিল। যুবক কৃষকপরিবারকে যথেষ্ঠ অর্থ প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন ইহার কোন রূপ অযত্ন না হয়। আমি সরায়ে যাইয়াই একজন চিকিৎসক পাঠাইয়া দিতেছি। ইনি ভাল হইলে যেখানে যাইতে চাহেন যাইতে দিও, আর এইটী ইঁহাকে দিও।" এই বলিয়া তিনি কৃষকের হস্তে একটি অঙ্গুরীয় দিলেন; তৎপরে বট বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। দুই ক্রোশ দূরে একটি সরাই ছিল; এইখানে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া তিনি একজন কবিরাজ পাইলেন। তাঁহার হস্তে দুইটি মোহর দিয়া বলিলেন, "এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পথের ধারে এক ঘর কৃষক বাস করে, তাহাদের বাটী আমি এক পীড়িতা বালিকা রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি যাইয়া তাহার চিকিৎসা করুন।" কবিরাজ কৃষকের বাটী আসিয়া বালিকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। আমাদের বলিতে হইবে কি যে বালিকা অন্য আর কেহ নহে, আমাদেরই মুরলা?

মুরলা কারাধ্যক্ষের নিকট বাদসাহের কথা শুনিয়া বাদসা-

হের নিকট যাইবার প্রতিজ্ঞা করিল। বাদসাহ কে, আর তিনি কোথায়ইবা থাকেন, তাহার সে কিছুই জানিত না, কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না; সে সেই রাত্রিতেই চলিল, কোথায় চলিল তাহার ঠিক নাই. সম্মুখে যে পথ দেখিল সেই পথ দিয়াই চলিল। পথে কি আহার করিবে এ চিন্তাও তাহার মনে একবার উদয় হয় নাই। পর দিন সে বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইল; কাহারও নিকট কিছু চাহিতে তাহার সাহস হইল না। পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষের ফল দুই একটা কুড়াইয়া আহার করিল, তৎপরে নিকটস্থ কর্দ্দমময় গর্ত্তের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। এইরূপে সে দিন রাত্রি চারিদিন চলিল; পথে কেহ কেহ তাহাকে সে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু সে কোনই উত্তর না দেওয়ায়, তাহারা আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। যে পথদিয়া মুরলা যাইতেছিল, সে পথ কোন গ্রামের নিকট দিয়া নহে; সুতরাং এই রাস্তায় যাহারা চলিত তাহাদের কাহারই অনর্থক কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার সময় থাকিত না; কেহ দিল্লী যাইবে, কেহ কাশী যাইবে; সকলেই অগ্রসর হইবার জন্য ব্যস্ত, অন্য কে কোথায় যাইবে কে জিজ্ঞাসা করে? এই জন্য মুরলাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ বিশেষ যত্ন করিয়া তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করে নাই; মুরলাও সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারে নাই। চারি-দিন অনাহারে চলিয়া মুরলা আর চলিতে পারিল না,—এক বটবৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিল, তৎপরে যে সে কি করিল তাহার কিছুই সে জানে না, কিন্তু পাঠক জানেন।

(৪)

১৫ দিবস চিকিৎসার পর মুরলা আরোগ্য হইল। তখন কৃষক তাহাকে সেই অঙ্গুরীয় দিল। মুরলা যুবকের কথা শুনিল, তৎপরে ভাবিয়া চিন্তিয়া অঙ্গুরীয়টী নিজ আঙ্গুলে পরাইয়া রাখিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "এক্ষণে তোমার পীড়াতো সারিল, এখন তুমি কোথায় যাইতে চাহ? সে যুবক কি তোমার কেহ হন?" মুরলা মথা নাড়িল। কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোথায় যাইবে, তোমাদের বাড়ী কোথায়?" তখন মুরলা একে একে সকল কথা কবিরাজ মহাশয়কে বলিল। পূর্ব্ব হইতেই মুরলার প্রতি কবিরাজ মহাশয়ের স্নেহ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পিতৃভক্তির কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন, "আমরা শীঘ্র তীর্থ ভ্রমণে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি; বৃন্দাবনেও যাইব। দিল্লী বৃন্দাবনের নিকট, আইস, আমি তোমাকে দিল্লী রাখিয়া আসিব।" মুরলা যে কখন দিল্লী যাইবার এরূপ সুবিধা পাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে সেই দিনই কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে চলিল।

তাঁহার বাটিতে সে একমাস থাকিল, তৎপরে সে তাঁহাদের সহিত প্রথমে গয়া, তৎপরে কাশী, তৎপরে প্রয়াগ তীর্থে আসিল। প্রয়াগে আসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের মাতার মৃত্যু হইল, সুতরাং তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার মনস্থ করিলেন। মুরলা বলিল, "আমাকে এইখানে রাখিয়া যান, বাদসাহের সহিত দেখা না করিয়া আমি ফিরিব না।" কবিরাজ মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না যে মুরলাকে তিনি ত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু কি

করিবেন, মুরলা নিতান্তই ফিরিবে না, তখন তিনি তাহাকে এক-জন পরিচিত পাণ্ডার বাটী রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মুরলা এক মাস এই পাণ্ডাঠাকুরের বাটী বাস করিল; তাহার নম্র স্বভাবে সেই বিদেশীগণও তাহাকে শীঘ্রই ভাল বাসিতে আরম্ভ করিল। এক মাস পরে দিল্লী হইতে কোন ধনী বনিকের পত্নী তীর্থার্থে প্রয়াগে আসিয়া সেই পাণ্ডার বাটীতেই বাসা করিয়া রহিলেন। পাণ্ডা তাঁহাকে মুরলার কথা সকল কহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবেই ইহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।" তিনি সম্মত হইলেন, মুরলা তাঁহার সহিত দিল্লী আসিল। এতদিন পরে সে বাদসাহের নিকট আসিল সত্য কিন্তু দেখিল যে সহজে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে না; ক্রমে সে দেখিল যে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। নানা স্থানের নানা লোক দেখিয়া মুরলা আর এক্ষণে বালিকা নাই। তাহার বয়সের পরিমাণে এক্ষণে তাহার জ্ঞান যথেষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহার জন্য বণিকপত্নী ও বণিক অনেক চেষ্টা করিলেন; কয়েকজন রাজপুরুষকেও বলিলেন; তাঁহারা বলিলেন "কে একটা সামন্য প্রহরী কোথায় কয়েদ হইয়াছে, তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য বাদসাহকে একথা বলিবে?" একজন বলিলেন, "যদি সুবাদারেরা একজন প্রহরীকেও কয়েদ করিয়া রাখিতে পারিবে না, বাদসাহ তাহাকে খালাস দিতে হুকুম করিবেন, তাহা হইলে আর সুবাদারী করিতে যাইবে কে? এতকষ্ট করিয়া এত দূরে আসিয়াও তাহার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না? মুরলার হৃদয়ে উৎসাহ দ্বিগুণিত হইল। সে দিবা

রাত্র কিসে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। দিল্লীতে তিন মাস থাকায় সে দিল্লীর অনেক চিনিল ও বুঝিল। তখন সে একদিন সাহস করিয়া বেগম মহলের দ্বারে আসিল; দেখিল একজন ঘোর কৃষ্ণকায় ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবার হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে। সে তাহাকে বলিল, "আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব।" খোজা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বেগম?" মুরলা জানিত না যে বাদসাহের প্রায় তিন সহস্র বেগম আছে; সে ভাবিয়াছিল একই বেগম। এক্ষণে কোন বেগম জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিল, "বড় বেগম।" "খোজা গম্ভীর ভাবে বলিল, "দরকার?" মুরলা বলিল, "দেখা করিব।" খোজা বলিল, "চলিয়া যও; দেখা হইবে না।" মুরলা চলিয়া আসিল, কিন্তু পরদিন ঠিক সেই সময়ে আবার গেল। তাহাকে খোজা প্রবেশ করিতে দিল না, মুরলা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পরদিন ঠিক সেই সময়ে আবার গেল। এইরূপে ১৫ দিন ধরিয়া সে এইরূপ করিল; তখন খোজা ভয়ানক রাগত হইয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিল। এই সময়ে একজন বাঁদী সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সে গোলযোগ শুনিয়া নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। খোজা কহিল, "এই মাগী ১৫ দিন ধরে অমায় বিরক্ত কচ্চে; বলে, 'বেগমের সঙ্গে দেখা করবো'—পাগল।" বাঁদী মুরলার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাও?—যশবন্তবাই বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে তোমার কাজ হয়?" মুরলা ঘাড় নাড়িয়া "হঁ্যা" বলিল। তখন বাঁদী বলিল, "একে যেতে দেও,—আমি এর জন্য

দায়ী থাকিলাম।" বাঁদীর সঙ্গে মুরলা বেগম মহলে প্রবিষ্ট হইল।

(৫)

মুরলা এক মনোহর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিয়া দেখিল সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রমণী কর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়া বেগম সাহেব যশবন্তবাই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বাঁদী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "এই বালিকা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। বেগম মহলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য মাসাবধি চেষ্টা করিতেছে।" বেগম মুরলাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আমার দ্বারা কি তোমার কোন উপকার হইতে পারে?" মুরলার প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, পরে সে ধীরে ধীরে তাহার সকল কথা বলিল, তখন তাহার পিতৃভক্তির কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। যশবন্তবাই বালিকার গণ্ডে সত্য সত্যই চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, যদি আমার কখন কন্যা হয় তবে যেন তোমার মতনই হয়। আমি যেমন করিয়া হয় তোমার পিতাকে কারামুক্ত করিব।" মুরলা কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, তৎপরে আহারাদি করাইয়া সেই বাঁদীকে সঙ্গে দিয়া যশবন্তবাই মুরলাকে বণিকের গৃহে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, "কাল প্রাতে আমার সহিত দেখা করিও।"

পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই মুরলা বেগম মহলে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার একলা যাইতে হইল না, সে বাটীর বহির্গত হইয়াই দেখিল, সম্মুখে পূর্ব্বের

পরিচিত বাঁদী। সে বলিল "আমি তোমাকেই লইতে আসিয়াছি।" তখন তাহারা দুইজনে বেগম মহলে আসিয়া যশোবন্ত বাইয়ের আবাসে উপস্থিত হইল; তথায় সেই সময়ে আকবর বাদসাহ বেগমের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বাঁদী মুরলাকে বলিল, "হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিতার জীবন প্রার্থনা করিয়া লও,—ঐ বাদসা।" যে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুরলা এতদিন এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সেই বাদসাহ সম্মুখে; সে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিলনা; তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল। সে দৃশ্যে পাষাণও গলিয়া যায়, বাদসাহের হৃদয় গলিবে আশ্চর্য্য কি? তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমার পিতাকে মুক্তি দান করিলাম,—তিনি কত দিন কারারুদ্ধ হইয়াছেন?" মুরলা কম্পিতস্বরে কহিল, "প্রায় এগার মাস হইবে।" ইহা শুনিয়া বাদসাহের মুখ বিষন্ন হইল, তাহা দেখিয়া বেগম বলিলেন,"আপনার মুখ বিষন্ন হইল কেন বাদসাহ বলিলেন, "মোগল সেনাপতিদিগের এই নিয়ম যে, কোন সৈনিককে বন্দি করিলে, হয় তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করেন, নতুবা কারারুদ্ধের ঠিক এক বৎসর শেষে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করেন। এই বালিকার পিতা শুনিতেছি এগার মাস কারারুদ্ধ হইয়াছে; তাহা হইলে তাহার জীবনের আর অন্ততঃ এক মাস মাত্র আছে। এমন কে আছে যে একমাসের মধ্যে আমার ক্ষমার আজ্ঞা লইয়া বঙ্গদেশের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারে। যাহা হউক যখন আমি তাহার মুক্তিদান করিয়াছি তখন যাহা হয় একটা করিবই। আকবর বাদসাহের সেনানী মধ্যে

এমন কেহ কি নাই যে, একমাসের মধ্যে ৫০০ শত ক্রোশ যাইতে পারিবে না?" তৎপরে তিনি মুরলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে সংবাদ দিব।" মুরলার এই সময়ে নিজ অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তাহার মনে সহসা একটী কথা উদিত হইল, সে অঙ্গুরীয়টী খুলিয়া হাতে লইয়া বলিল, "আমাকে একজন এক সময়ে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি দেখি নাই, চিনি না; তবে তিনি যে একজন বীর তাহা আমার বিশ্বাস আছে। যদি তিনি দিল্লী থাকেন তবে এই অঙ্গুরীয়টী দেখাইলে হয়তো তিনি আমার এই কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারেন।" আকবর বলিলেন "ভালই রাখিয়া যাও।" মুরলা ধীরে ধীরে আসিয়া বাদসাহের হস্তে অঙ্গুরীয় দিল, তিনি অঙ্গুরীয় দেখিয়া চমকিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। মুরলা বণিকের গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

(৬)

সেই দিবস বৈকালে বাদসাহ প্রাসাদ উদ্যানে তাঁহার অমাত্য ও সেনানীগণকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন; তথায় সকলে উপস্থিত হইলে বাদসাহ বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কে কত দিবসে বঙ্গদেশের যশো-হর নগরে উপস্থিত হইতে পার?" তখন সাহাজাদা সেলিম বলিলেন, "বাদসাহের আজ্ঞা হইলে আমি দুই মাসে বঙ্গ দেশে উপস্থিত হইতে পারি।" বাদসাহ মস্তক নাড়িলেন, বলিলেন, "ইহাপেক্ষা কেহ শীঘ্র পার?" এক জন মুসলমান যোদ্ধা বলিলেন, "আজ্ঞা হইলে আমি একমাসে পৌছিতে পারি।" আর একজন বলিলেন, "আমি ২৫ দিবসে পারি।" একজন

রাজপুত যোদ্ধা বলিলেন, "আমি ২০ দিবসে পারি।" বিকানিয়রের রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "আমি ১৫ দিবসে পৌঁছিতে পারি।" বাদসাহ সকলের কথা শুনিয়া একটী রাজপুত যুবককে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "ভুপেন্দ্রসিংহ, তুমি কথা কহিতেছ না কেন? তুমি তো বঙ্গদেশে দুই একবার গিয়াছ, তুমি কত দিনে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইতে পারিবে বিবেচনা কর?" ভুপেন্দ্র সিংহ মানসিংহের পুত্র, তিনি বলিলেন, "বাদসাহ যে কয় দিনে পৌঁছিতে হুকুম করিবেন সেই কয় দিনের মধ্যেই পৌঁছিব।" তখন আকবর একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "সাত দিবসে পার?" চারিদিকে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "অসম্ভব" শব্দ উঠিল,—কেহ কেহ ভুপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, ইহাতে ভুপেন্দ্রের রাজপুত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "বাদসাহের অনুগ্রহে ও মানসিংহের আশীর্ব্বাদে তাহাও পারি।" সকলেই এই কথা শুনিয়া মুখ চাওয়া চাহিই করিতে লাগিলেন; আকবর কেবল বলিলেন, "দেখিব।" তৎপরে তিনি মুরলার সেই অঙ্গুরি লইয়া বলিলেন, "এ কাহার অঙ্গুরীয় চিনিতে পার?" ভুপেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "এ অঙ্গুরীয় দাসের,—আমি বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে একটী অর্দ্ধমৃতা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে এক কৃষকের গৃহে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আসি; আমি আসিবার সময় এ অঙ্গুরীয় তাহাকেই দিয়া আসিয়া ছিলাম।" আকবর তখন মুরলার কথা সকলকে বলিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তুমি কল্যই এই বালিকাকে লইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা কর। উজির সাহেব তোমাকে পরওয়ানা দিবেন,—পথে তোমার কোন স্থানে

কিছুরই অভাব হইবে না। সকল সুবাদারকেই পরওয়ানা দেওয়া যাইবে।" তৎপরে সকলেই মুরলার পিতৃভক্তির প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কুমার ভূপেন্দ্র সিংহও প্রস্তুত হইতে গৃহে প্রস্থান করিলেন, সাত দিবসের মধ্যে তাহাকে দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে।

(৭)

এক দিন প্রত্যুষে যশোহর নগরের পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে; সকলেই যেন বড় ব্যস্ত, সকলেই নগরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রান্তরের দিকে চলিয়াছে; কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই এত প্রত্যুষে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রান্তরে সেই প্রাতে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছে, সকলেই বিষণ্ণ ও উৎসুক। জনতার মধ্যস্থলে কাষ্ঠে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মঞ্চের উপর কয়েক জন মুসলমান সৈনিক দণ্ডায়মান;—চারিদিকে জনতার মধ্যেও অনেক মুসলমান সৈন্য সদর্পে পদচারণ করিতেছিল।

এক স্থানে কয়েকজন লোক দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "মুরলার কোনই সম্বাদ পাওয়া গেল না?" আর একজন উত্তর করিলেন, "না।" একজন বলিলেন, "রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার মনে কি ইচ্ছা আছে। তাহাতে নাকি রঘুনাথ বলিয়াছিল, আর কোন ইচ্ছা নাই—আমার মুরলাকে যদি একবার এনে দেখাতে পার তবে আর মরিতে আমার কোন কষ্ট নাই।" অন্যজন বলিলেন, "এও পাজি সুবাদারের কাজ! আমার তো মনে হয় ঐ মুরলাকে কোথায় পাঠিয়েছে।"

একজন বলিলেন, "আশ্চর্য্য কি ?" এই সময়ে জনতার মধ্যে একটা গোল উঠিল, সকলে দেখিলেন প্রায় এক শত সৈন্য বেষ্টিত হইয়া রঘুনাথ আসিতেছে। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি ও স্থির পাদক্ষেপ দেখিয়া সকলেরই মনে দুঃখের উদয় হইল ;— একটা অর্দ্ধস্ফুট স্বর জনতার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উত্থিত হইল। যাঁহারা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমরা এতজন, আমাদের সম্মুখে আমাদের একজনকে কুকুরের ন্যায় মারবে আর আমরা তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিব, আইস, দেখি উহাকে ছিনিয়া লইয়া যাইতে পারি কি না।" আর একজন বলিলেন, "ভাই, শিক্ষিত সেনার সহিত অশিক্ষিত লোকের যুদ্ধ করা পাগলামী। রাজা প্রতাপাদিত্যই হারিলেন—আমরা আর কি করিতে পারি।" সেই যুবক কিছু না বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এ দিকে সৈনিকেরা রঘুনাথকে মঞ্চে তুলিল। প্রায় এক বৎসর তিনি কারাগারে বন্দি থাকিয়া একদিন তিনি সুবাদারের সম্মুখে আনিত হইলেন ; সুবাদার তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমি তোমায় ক্ষমা করিতে পারি ; নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। অনর্থক বন্দি করিয়া রাখিয়া আমরা কারাগার পূর্ণ রাখি না।" রঘুনাথ কন্যা হারাইয়া আর জীবন রক্ষার ইচ্ছা করেন নাই, বাঁচিবার ইচ্ছা তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছিল না। তিনি বলিলেন, "যদি কোন দোষ করিতাম তবে ক্ষমা চাহিতাম।" দেশের জন্য, রাজার আজ্ঞায় যুদ্ধ করিয়াছি ইহাতে কোনই দোষ করি নাই ; সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনাও

করিব না।" তৎপরে রঘুনাথের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল ;—দিন স্থির হইল ; অতি প্রত্যুষে সৈনিকেরা আসিয়া তাঁহাকে বধ্য-ভূমে লইয়া চলিল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কাজি সাহেব আসিলেন, আর পাঁচ মিনিট—তৎপরে বধ্যভূমি রঘুনাথের রক্তে প্লাবিত হইবে। এই সময়ে সকলে দেখিল যে দুইজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে অশ্বকে তাড়িত করিয়া সেই দিকে আসিতেছেন ;—সকলের মনেই কেন জানি না আশার সঞ্চার হইল, সকলে সেই অশ্বারোহীদ্বয়কে দেখিয়াই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই অশ্বারোহীদ্বয় জনতার ভিতর আসিয়া পড়িল, দুইটী অশ্বই ঘর্ম্মে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, মুখ দিয়া অজস্র ফেণ নির্গত হইতেছে, সমস্ত অঙ্গ হইতে ধূম উত্থিত হই-তেছে। একটী অশ্বে একজন রাজপুত যোদ্ধা ;—তিনি অশ্বের মুখরজ্জু একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বামহস্তে তাঁহার পার্শ্বস্থিত অপর অশ্বারোহীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া একখানি কাগজ মস্তকের উপর আন্দোলিত করিতেছেন। অপর অশ্বারোহী পুরুষ নহেন—একটী বালিকা। তাহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া পশ্চাতভাগে নাচিতেছে ; তাহার অঙ্গ যেন অবশ হইয়াছে,—সে অশ্ব হইতে পড়ে পড়ে। তাহাকে দেখিয়াই জনতার সমস্ত লোক "মুরলা, মুরলা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ; সেই শব্দ রঘুনাথের কর্ণে গেল, তিনি সেই সময়ে জানু পাতিয়া বসিয়া ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেছিলেন। জনতার উচ্চ কলরব ও মুরলার নাম তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি এক লম্ফে একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে অশ্বা-

রোহীদ্বয় জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন। রাজপুত যুবক প্রথমে লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইলেন, তৎপরে ধরিয়া মুরলাকে নামাইলেন। মুরলা দ্রুতবেগে মঞ্চে উঠিল, রঘুনাথ সৈনিকদিগের হস্ত হইতে সবলে আপনাকে ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন "মা, এলি।" "বাবা আমি এসেছি।" এই বলিয়া মুরলা ঝম্প প্রদান করিয়া পিতার বক্ষে যাইয়া পড়িল, তৎপরে চারিদিক হইতে এক গোল উঠিল।

(৮)

ভূপেন্দ্র সিংহ পরদিন প্রাতে বঙ্গদেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে এক সপ্তাহে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবে; তিনি একলা হইলেও যাহা হয় হইত; তাঁহার সঙ্গে এক ক্ষুদ্র বালিকা। মুরলা সঙ্গে যাইবে, সে বাদসাহের পা ধরিয়া কাঁদিয়া এ ভিক্ষা মাগিয়া লইল। সে বলিল. "বাদসাহের অনুগ্রহ সংবাদ পিতাকে আমি স্বয়ং দিব।" বাদসাহ ভূপেন্দ্র সিংহকে এ কথা বলিলেন; তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন. "আচ্ছা, সঙ্গে লইব।"

তৎপর দিবস তাঁহারা এক দ্রুতগামী ছিপে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। দিন রাত্রি অবিরাম চলিয়া আসিয়া তাঁহারা ছয় দিনের দিন কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। কাটোয়া হইতে যশোহর প্রায় ৩০ ক্রোশ। পথে পাঁচ ছয় স্থানে তাঁহারা দাঁড়ী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। মাজীরা ক্লান্ত হইয়া পড়ে; অমনি ভূপেন্দ্র সিংহ বাদসাহের পরওয়ানার বলে নূতন লোক সংস্থান করিয়া লয়েন। দিন রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও

কোথাও তিনি বিলম্ব করেন নাই। কাটোয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা নদীর স্রোত তাঁহাদের সপক্ষে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে আর পাই-লেন না, সুতরাং কাটোওয়া হইতে নৌকাযোগে যশোহরে যাইতে হইলে তাঁহাদের আরও তিন দিন লাগে, অশ্বারোহণে না গেলে এক দিবসে যশোহরে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। ভূপেন্দ্র সিংহ কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন, মুরলাকে বলিলেন, "এখান হইতে ঘোড়ায় না গেলে এক দিনে পৌছান অসম্ভব; তুমি থাক, আমি যাই।" মুরলা কহিল, "বাবা আমাকে ঘোড়ায় চড়িতে শিখাইয়াছিলেন,—আমিও ঘোড়ায় আপনার সঙ্গে যাইব।" ভূপেন্দ্র কাটোয়ার সুবেদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুইটী খুব উত্তম অশ্ব সত্বর সজ্জিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। সুবাদারের নিকট তিনি শুনিলেন যে যশোহরে কাল প্রাতে এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে, সেই রঘুনাথ কিনা তাহা তিনি বলিতে পারি-লেন না। ভূপেন্দ্র সিংহের মনে কিন্তু সন্দেহ হইল, তিনি এ বিষয়ের কিছুই মুরলাকে বলিলেন না। কাটোয়ায় পৌছিতেই তাঁহাদিগের সন্ধ্যা হইয়াছিল; আহারাদি করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দশটা হইল,—তৎপরে তাঁহারা দুই জনে অশ্বারোহনে যাত্রা করিলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তাঁহাদের সেই অন্ধকারে দ্রুত বেগে অশ্ব ধাবিত করা অসম্ভব হইল। যখন ভোর হইল, তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাঁহারা যশোহর হইতে এখনও ছয় ক্রোশ দূরে আছেন। এই স্থানে তাঁহারা জানিলেন যে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই রঘুনাথেরই প্রাণ দণ্ড হইবে, চারি-দিকের অনেক লোক তাঁহার প্রাণ দণ্ড দেখিতে গিয়াছে। তখন আর সময় নাই। তখন তাঁহারা দুই জনে বায়ুবেগে অশ্ব ধাবিত

করিলেন। তাঁহারা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

রাজা মানসিংহের পুত্র ভূপেন্দ্র সিংহ উপস্থিত, কাজি দণ্ডায়মান হইয়া মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার সন্মাননা করিলেন,—তৎক্ষণাৎ রঘুনাথের মুক্তির সম্বাদ প্রচার হইল। চারিদিকে মহাগোল উঠিল। সুবাদারের নিকট সংবাদ গেল, তিনি অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পরওয়ানা চুম্বন করিয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন; তিনি ভূপেন্দ্র সিংহের সমুচিত সম্মাননা করিতে লাগিলেন। তৎপরে রঘুনাথ ও মুরলা সেই পাঁচ সহস্র লোকে বেষ্টিত হইয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। মুরলার পিতৃভক্তি, মুরলা যে দিল্লী যাইয়া বাদসাহের নিকট পিতার প্রাণদান ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে প্রচার হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকেরা তাহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। নগর শুদ্ধ লোক তাহাকে দেখিতে বহির্গত হইল।

(৯)

তাহার পর যাহা হইল তাহা যদি কেহ বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে আর তাঁহার গল্প শুনিয়া কাজ নাই। সাত দিন ধরিয়া মুরলার ন্যায় বালিকার সহিত একত্রে ভ্রমণ করিয়া যদি ভূপেন্দ্র সিংহের মন মুরলাময় না হইত তবে ভূপেন্দ্র সিংহকে আমরা পশু বলিতাম। মানসিংহের অনুমতি পাইয়া ভূপেন্দ্র সিংহ মুরলাকে বিবাহ করিলেন, তৎপরে তাঁহারা ও রঘুনাথ দিল্লী যাত্রা করিলেন।

জগৎশেঠের কন্যা।

(১)

ফরিদপুর জেলায় অনেক বড় বড় বিল আছে। এই সকল বিলের মধ্যে একরূপ এ পৃথিবীর গোলযোগের বহির্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর কৃষকেরা বাস করে। এই সকল বিলের মধ্যে 'কোটালি-পাড়ের' বিলই সর্ব্ব বৃহৎ; এই বিলের ভিতরে কৃষকদিগের মধ্যে একটী ভদ্র পরিবার বাস করেন। ইঁহারা কোন হিন্দু দেব দেবীর পূজা করেন না; ইঁহাদের গৃহে "অসামান্যা" নামে এক দেবী মূর্ত্তি আছে। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ইঁহারা নিজেই এই দেবীর পূজা করেন; কোন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা রাখেন না। মন্ত্রটী সংস্কৃত ভাষায়, বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়;—

"অসামান্যা দেবি আপনাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি। আপনি আমাদের মঙ্গল করুন, আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাকে নমস্কার করি।"

হিন্দু শাস্ত্রে অসামান্যা বলিয়া কোন দেবী নাই; তবে এই অসামান্যা কে? আর তিনি এমন কি কার্য্যই বা করিয়াছিলেন যে লোকে তাঁহার পূজা করে? এক বৎসরের অনুসন্ধানের পর এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংস্থান করিতে পারিয়াছিলাম একণে পাঠকদিগকে তাহা বলিব।

(২)

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এক দিবস সন্ধ্যাকালে কাটোয়ার নিকট আসিয়া একদল ইংরাজ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। কয়েক ঘণ্টা মাত্র ইহারা এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া নিশীথ রাত্রিতে আঁধার নীরবে গঙ্গার ধার দিয়া সদর্পে চলিল; অতি প্রত্যুষে পলাশীর মাঠে আসিয়া সকলে দাঁড়াইল। অদূরে বঙ্গের নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইংরাজ সৈন্য নীরবে দাঁড়াইল, মুহূর্ত্ত পরে অগ্রবর্ত্তী কামানে অগ্নি সংযোগ করিল; অমনি চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া বজ্রতুল্য শব্দ গর্জ্জিয়া উঠিল, সেই শব্দের সহিত সমস্ত ইংরাজ সৈন্যও বিকট শব্দ করিল; কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আন্দাজ পাঁচ শত হইবে একদল মুসলমান সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের দিকে ছুটিল। পাঁচ মিনিট যুদ্ধ হইতে না হইতে যুদ্ধ শেষ হইল শেষে সেই পাঁচ শত যোদ্ধা যুদ্ধ হইতে সহসা নিরস্ত হইল; ইংরাজেরা তখন সিংহ পরাক্রমে উহাদের উপর যাইয়া পড়িল। দেখা গেল অদূরে নবাবের ৫০ সহস্র অশ্বারোহী ও ৬০ সহস্র পদাতিক উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। পাঁচ মিনিট এইরূপ যুদ্ধের পরই বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইল। দূরে আম্র বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ত্রিশূল হস্তে জটাজুটধারিণী এক সন্ন্যাসিনী এই ব্যাপার নীরবে দেখিতেছিলেন; তিনি যখন দেখিলেন অসংখ্য মুসলমান সৈন্য দুই মিনিটও যুদ্ধ না করিয়া পলাইল তখন আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

(৩)

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে আম্রবন ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপরে জনৈক মুসলমান ফকির বসিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিনীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" সন্ন্যাসিনী, ধীরে ধীরে পদপ্রক্ষালন করিয়া নৌকায় উঠিয়া বলিলেন "হইয়া গিয়াছে।" ফকির আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'হইয়া গিয়াছে! এত শীঘ্র?" "সে তো যুদ্ধ হইল না, একদল আসিল আর এক দল পলাইল, এখন চলুন," এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী ত্রিশূল দিয়া এক জন নাবিককে ঠেলিয়া দিলেন, সে নীরবে নৌকা খুলিয়া দিল। তখন ফকির আবার বলিলেন, "এখন কোথায় যাইতে হইবে?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আপনি জানেন এখনও তো কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও তো প্রতি-হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই।" ফকির বলিলেন, "আর কেন, ক্ষমা কর।" ফকিরের এই কথায় সন্ন্যাসিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ক্ষমা তো নাই, পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব।" ফকির আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, নাবিকদিগকে বলিলেন, "উজান যাও।"

এইরূপে নৌকা সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রি চলিল। এক বার মাত্র মুরসিদাবাদে লাগিয়াছিল; পর দিবস বেলা দুইটা পর্য্যন্তও চলিল। সন্ন্যাসিনী সর্ব্বদাই গঙ্গার উপকূলাভিমুখে চাহিয়াছিলেন; এক্ষণে যেন কি দেখিয়া সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন ও চিৎকার করিয়া নাবিকদিগকে নৌকা কূলে লাগা-ইতে বলিলেন। গঙ্গার স্রোত সেই স্থানে এত খরতর বহিতে-

ছিল যে, নৌকা কূলে লইয়া যাওয়া কঠিন হইল। সন্ন্যাসিনী পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় নৌকার উপর পদচারণ করিতে লাগিলেন, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন সঁাতরাইয়া কূলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। ফকির নৌকায় দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিলেন; যখন সন্ন্যাসিনীকে আর দেখা যায় না তখন বলিলেন, "পাগ্‌লী আমাকে পাগল করিবে।" ইত্যবসরে নৌকা কূলে লাগিল, সন্ন্যাসিনী যে পথে গিয়াছিলেন ফকির নৌকা ত্যাগ করিয়া সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

সন্ন্যাসিনীবেশে যাহাঁকে দেখিলেন তাঁহার পরিচয় প্রদান এক্ষণে কর্ত্তব্য। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গের ধনকুবের জগৎশেঠের যত্নেই সিরাজুদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত হয়েন এবং ইংরাজ রাজ্য বঙ্গে স্থাপিত হয়। বোধ হয় ইহাও সকলে জানেন যে মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠের কন্যার শয়ন-গৃহে নবাব সিরাজুদ্দৌলা একদিবস প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিবার উদ্যম করেন; কিন্তু ইহা বোধ হয় কেহ অবগত নহেন যে সেই কন্যার স্বামী জগৎবল্লভ শ্রেষ্টি তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর এইরূপ অপমানের দণ্ড দিবার জন্য সিরাজুদ্দৌলাকে এক দিবস প্রকাশ্য রাজপথে আক্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুর সিরাজুদ্দৌলা এই বীরের মস্তক জগৎশেঠের বাটী পাঠাইয়া বলিয়া পাঠান, "ইহা তোমার রূপসী কন্যা অসামান্যার জন্য।" এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে তাঁহাদের মনে কিরূপ ভাব হইয়াছিল তাঁহা বলা বাহুল্য।

যে দিবস স্বামীর এইরূপ নৃসংশ হত্যা হয়, সেই দিবস রাত্রে অসামান্যা বাটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এক বৎসর আর কেহ তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই। অসামান্যা বাটী ত্যাগ করিয়া সেই রাত্রে মুরসিদাবাদের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী শঙ্করপুর নামক স্থানে গিয়া কালী পূজা করিলেন, এই স্থান শাক্তদিগের প্রধান স্থান বলিয়া সকলেই জানিত; দুর্দ্দান্ত সিরাজুদ্দৌলাও এই স্থানের শাক্ত সন্ন্যাসীদিগকে ভয় করিতেন। অসামান্যা ঘোর নিশীথ রাত্রিতে আসিয়া এক মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিলেন; তখন এক সন্ন্যাসী দ্বার উন্মুক্ত করিলেন ও অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এত রাত্রে কার সঙ্গে আসিলে? কেমন করিয়া আসিলে?" তখন অসামান্যা বলিতে লাগিলেন, "কাকা, আর কি অসামান্যা সে অসামান্যা আছে! আর কি সে মকমলের উপর চলিতে ক্লেশ অনুভব করে! আপনি কি সকল শুনেন নাই?" অসামান্যার খুল্লতাত যৌবনে মুসলমান কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ভারতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংশ করিবার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; অসামান্যাকে ইনি কন্যাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন, "এখন কি করিতে চাহ?" অসামান্যা কহিল, "কি করিতে চাহি? প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা! সিরাজুদ্দৌলার শেষ না করিতে পারিলে আমার শান্তি নাই। কাকা, কাকা, কাকা, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ঐ তিনি, ও রক্ত আমি দেখিতে পারি না, তিনি আমাকে অঙ্গুলী দিয়া রক্ত দেখাইতেছেন। যদি সতী হই, যদি পতিব্রতা হই তবে ইহার প্রতি—।" অসামান্যা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িতেছিলেন সন্ন্যাসী ধরিলেন।

(৫)

এই ঘটনার এক বৎসর পরে মুরসিদাবাদে দুই জন লোক লইয়া বড় গোল উঠিল। একজন 'আলমজা' নামে খ্যাত মুসলমান ফকির, আর একজন এক পাগলিনী, লোকে ইহাকে 'ভগী পাগ্‌লী' বলিত। বলিতে হইবে কি যে মুসলমান ফকির অসামান্যার খুল্লতাত শাক্ত সন্ন্যাসী আনন্দচাঁদ জগৎশেঠ, আর ভগী পাগলিনী আমাদিগের অসামান্যা দেবী। একজনের উদ্দেশ্য মুসলমান রাজ্যধ্বংশ, অপরের উদ্দেশ্য সিরাজুদ্দৌলাকে ধ্বংশ।

ফকির ঔষধ বিতরণ করিয়া ও ভবিষ্যৎ বলিয়া শীঘ্রই মুসলমান সমাজে একাধিপত্য লাভ করিলেন; ক্রমে প্রধান প্রধান ওমরাওগণকে পর্য্যন্তও নিজ দাসের ন্যায় করিলেন; তখন কোন মুসলমানের এমন সাহস ছিল না যে তাঁহার কথা অমান্য করে। এ দিকে ভগী পাগলিনী কৃষ্ণনগরে যাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কালীর কথা কহিয়া, রাজ নগরে যাইয়া রাজবল্লভকে অন্নপূর্ণার কথা কহিয়া, তাঁহাদের ভক্তির পাত্রী হইলেন। মুরসিদাবাদে সকলেই তাঁহাকে ভয়ানক পাগল মনে করিয়া ভয় করিত। পাগলিনীর অলোকসামান্য রূপ লাবণ্য, ছিন্ন বস্ত্র ও মলিনতার মধ্য হইতে মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইত। সকলেই ভাবিত এ রূপবতী যুবতী কিরূপে পাগল হইল ?

একদিবস পাগলিনী ও ফকির উভয়ে নিভৃতে জগৎশেঠের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; জগৎশেঠ ও তাঁহার পত্নী কন্যাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অসামান্যা কিছুতেই শুনিলেন না, বলিলেন "পরে তাহা হইবে।"

সেই দিন হইতে জগৎশেঠের লুপ্তপ্রায় ক্রোধ পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। তিনি সিরাজকে নাশ করিবার প্রধান উদ্যোগী হইলেন। মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ, প্রিয় কন্যা ও আনন্দচাঁদকে সহায় করিয়া গোপনে সিরাজুদ্দৌলার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে হিন্দু মুসলমান সকলেই সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত হইল। তৎপরে ইংরাজদিগকে নিমন্ত্র করা হইল। সিরাজ ইংরাজ আগমন বার্ত্তা পাইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ মুর্শিদাবাদেরদিকে অগ্রসর হইল, পলাশীতে যুদ্ধ হইল; অসামান্যা দাঁড়াইয়াযুদ্ধ দেখিয়াছিলেন তাহা পাঠক অবগত আছেন; পরে খুল্লতাতের সহিত সিরাজের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাও অবগত আছেন। সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়াই খুল্লতাত অসামান্যাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন; অসামান্যা তাহা শুনিলেন না। তাহার চক্ষের উপর স্বামীর ছিন্নমস্তক দিবারাত্রি নাচিতেছিল; এখন তিনি উম্মাদিনী!

ফকির ও অসামান্যা মুরসিদাবাদে আসিয়া জানিলেন, সিরাজ একাকী পদব্রজে ভগবানগোলার দিগে গিয়াছেন। তাঁহারাও নৌকায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

(৬)

সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার পক্ষে আর কেহ নাই দেখিয়া পলাশীতে যুদ্ধ স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিলেন যে যদিও যুদ্ধ হইল না সত্য, কিন্তু তিনি হারিলেন, সিংহাসনচ্যুত হইলেন। সিরাজুদ্দৌলার এই সময়ে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম

হইয়াছিল; দুঃখ কি তাহা তিনি এত দিন বুঝেন নাই; এক্ষণে তাঁহার বড়ই প্রাণের মায়া হইল, তিনি তো মরিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুরসিদাবাদে আসিয়া তিনি তাঁহার সকল পরিজনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী পলায়ন করিলেন। হায়, যে এক দিবস মকমলের উপর দিয়া পদচারণ করিতে পায়ে বেদনা বোধ করিত, আজ সে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে, কণ্টকে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তে রক্তাক্ত হইয়াছে। সিরাজ, তুমি যে সকল ভয়ানক কার্য্য করিয়াছিলে, তাহারই ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; উপরে কি কেহ নাই?

সিরাজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলেন. পশ্চাতে একবারও ফিরিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে তিনি আর চলিতে পারিলেন না, ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায় কোথায় আসিলাম!" পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল "যমালয়ে।" সিরাজ চমকিত হইয়া একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন, দেখিলেন সম্মুখে শাণিত ছুরিকা হস্তে এক রাক্ষসী; সে আর কেহ নহে সে ভগী পাগলিনী। তখন সিরাজ কহিলেন, "তুমি কে?" পাগলী বলিল, "আমি রূপসী অসামান্যা, জগৎ শেঠের কন্যা!" সিরাজ তখন এই কয়টী কথা মৃদুস্বরে দুই তিনবার উচ্চারণ করিলেন, "হাঁ মনে পড়িয়াছে, তোমার স্বামীর মস্তক তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আমার মস্তক তাঁহাকে পাঠাইতে আসিয়াছ, ভাল।" সিরাজ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পাগলিনী সেই স্থানে বসিয়া অঞ্চল দ্বারা সিরাজকে বাতাস দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যে তাঁহার রক্তপাত করিয়াছিল, সে

আমার নিকট আজ মূর্চ্ছিত, এখন এই শাণিত ছুরিকায় সমস্ত শেষ করিতে পারি ; না, প্রাণ নাশ করিব না। আমি স্ত্রীলোক, নরাধমের অনেক দণ্ড হইয়াছে, যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট ; কিন্তু ওকি, ওকি!" পাগলিনী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওই সেই আবার, সেই রক্ত, সেই রক্ত, সেই রক্ত, ওই, ওই ; এই পামরের রক্তে আজ তাঁহার রক্ত ধুইয়া ফেলিব, স্বামিন্! বল দাও, বল দাও, আজ স্ত্রীর কার্য্য করি।" এই বলিয়া অসামান্যা শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিলেন ; কিন্তু তাহা সিরাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল না, ফকির হাত ধরিলেন। বাঘিনী ফিরিয়া বলিল, "ছাড়, ব্রত উৎযাপন করি।" ফকির ছাড়িলেন না ; বলিলেন, "বৎসে, তোমায় সব করিতে দিয়াছি, এটী করিতে দিব না। এতদিন তোমার সাথে তোমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সব করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে তোমার হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত করিতে দিব না। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি এই পামরের রক্তপাত না হইলে তোমার চিত্ত স্থির হইবে না ; ইহার রক্তপাত হইবেই—তুমি সে কার্য্যসাধন করিয়া কেন হস্তকে কলঙ্কিত করিবে? অনেকের রক্ত ইহার মস্তকে রহিয়াছে ; ইহার রক্তপাত ইহার স্বজাতিগণই করুক, আমরা কেন করিতে যাইব? তুমি স্বামী হন্তার উপযুক্ত দণ্ড দিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, এমন পতিব্রতার নামে কি নরহন্তা সংযোগ হওয়া উচিত? তোমায় সব করিতে দিয়াছি এইটী করিতে দিব না।" অসামান্যা খুল্লতাতের বুকে মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য তিনি আজ প্রথম কাঁদিলেন।

(৭)

তাহার পর সিরাজের যাহা হইল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। ফকির মিরজাফরের লোকের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করিলেন। সিরাজ মুরসিদাবাদে আনীত হইলেন। সে সময়ে মিরজাফর অহিফেণ সেবন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার পুত্র মীরণ মহম্মদী বেগ নামক এক পাষণ্ডকে সিরাজের প্রাণ নাশ করিতে আজ্ঞা দিল। সে কারাগারে গিয়া সিরাজের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিরাজের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ হস্তী পৃষ্ঠে কবরে নীত হইল, তথায় বিনা সমারোহে বঙ্গেশ্বরের দেহ প্রোথিত হইল। ভগী পাগলিনী দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহাকে তথা হ[illegible] বিদূরিত করিতে কোন মুসলমান সৈনিকই সাহস করিল না। যখন সিরাজের উপর মৃত্তিকা প্রদান হইল তখন ভগী নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শঙ্করপুরের দিকে চলিল। রাত্রি প্রায় আট ঘটীকার সময় ভগী আসিয়া খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল ; এখানে আনন্দচাঁদ জগৎশেঠ আর ফকির বেশধারী নহেন, তিনি অসামান্যাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বৎসে, তোমার কার্য্য তো শেষ হইয়াছে, এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার মাতা ও পিতা উভয়েই আসিয়াছেন ঐ মন্দিরে তাঁহারা আছেন, তোমাকে লইতে আসিয়াছেন।" অসামান্যা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "কি করিতে যাইব ?" আনন্দচাঁদ বলিলেন, "কেন, তোমারই সর্ব। তোমার পিতা মাতার আর কে আছে ? এই অতুল ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার।" তখন অসামান্যা বিষাদ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাকা, আপনি এই কথা বলিলেন ? সেখানে ধন আছে সত্য কিন্তু নারী

জাতির যে ধন, সে ধন কি সেখানে আছে? যাহা হউক অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আমি তথায় আর যাইব না, আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়াছি, যত দিন বাঁচিয়া থাকি তাঁহারই ধ্যান করিয়া জীবনাতীত করিব; আর প্রায়শ্চিত্ত করিব।” আনন্দচাঁদ বিষাদ স্বরে কহিলেন, “প্রায়শ্চিত্ত কেন?” অসামান্যা সোৎসাহে ও সবেগে কহিলেন, “আমি একজনের সর্ব্বনাশ করিলাম, অবশেষে প্রাণনাশ করাইলাম,—আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব না তো কে করিবে? এক্ষণে কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর গৃহে যাইব না— দেশে দেশে পরব্রতে ঘুরিব, আর এইরূপ রাত্রিতে তাঁহার ধ্যান করিব। চলুন পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া যাইব। তাঁহারা কখন আমাকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিবেন না।” এই কথা বলিয়া অসামান্যা উঠিলেন,—সন্ন্যাসীও উঠিলেন। উভয়ে একটী মন্দিরের দিকে চলিলেন। অসামান্যার মাতা কত কাঁদিলেন, পিতা কত বুঝাইলেন; অসামান্যা কিছুতেই বুঝিলেন না। তখন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিবস অসামান্যা মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া চলিলেন;— আনন্দচাঁদ অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, পরে বলি- লেন, “বৎসে, তোমায় ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চাহে না, সঙ্গে তো যাইবার যো নাই, এখানে থাকনা কেন?” অসামান্যা কহিলেন, “কাকা, ও অনুরোধ করিবেন না। মুরসিদাবাদে থাকিলে আমার সেই সব কথা মনে পড়ে; আমি মুরসিদাবাদে থাকিলে আবার পাগল হইব।” আনন্দচাঁদ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার ব্রতপালন করিয়া

তুমি কালী নামে ভাসিলে, কালী জানেন আমার ব্রত কবে শেষ হইবে।” অসামান্যা কহিলেন, “কেন কাকা, সিরাজতো গিয়াছে, ইংরাজও তো আসিয়াছে। আপনিই জানেন কেন আপনি ইংরাজকে দেশে আনিতে চাহেন—আমি স্ত্রীলোক কি বুঝিব?” আনন্দচাঁদ কহিলেন, “ইংরাজ না আসিলে ভারতবর্ষের উদ্ধার নাই, মা ইহা বলিয়াছেন। তাহাই ইংরাজকে আনিতেছি। কবে কার্য্য শেষ হইবে তাহা তিনিই জানেন।” অসামান্যা কোন কথা কহিলেন না, বলিলেন, “তবে আপনি আসুন, আমি যাই।” এই বলিয়া অসামান্যা ‘খেয়া’ নৌকায় উঠিলেন। আনন্দচাঁদ সজল নয়নে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে নৌকা পর পারে লাগিল, আর অসামান্যাকে দেখা গেল না।

আনন্দচাঁদ জগৎশেঠের ইতিহাস বর্ণন এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা দেখাইতে পারিতাম কিরূপে ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, কিরূপে তৎপরে মিরকাশিমকেও মিরজাফরের পথগামী করাইলেন। যে দিন মুরসিদাবাদে ইংরাজ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন, সেই দিবস আনন্দচাঁদ ভ্রাতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলেন, আর দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। হায়! আমাদের ইতিহাস নাই, ভিতরে ভিতরে কতজন কত কি করিয়াছেন তাহার আমরা কি কিছুই জানি না?

(৮)

অসামান্যার মুরসিদাবাদ ত্যাগের সাত বৎসর পরে বঙ্গদেশে এক ভয়ানক ঝড় হইল। সেই প্রলয়ে বঙ্গ দেশের প্রান্ত হইতে

প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইল, কত নগর নগরী ধ্বংশ হইয়া গেল, কত লোক প্রাণ হারাইল তাহার সংখ্যা হইল না। এই মহা প্রলয়ের দিবস বায়ুতাড়িতা উন্মাদিনী পদ্মার কূলে ত্রিশূল হস্তে অসামন্যা দেবী দাঁড়াইয়া দূরস্থ একখানি নৌকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, সেই বিদ্যুৎআলোকে নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছে, প্রলয়পবনে সন্ন্যাসিনীর জটাজুট উড়িতেছে, সেই বিষন্ন বদনে বিদ্যুৎ-আলোক পড়িয়া কি ভয়ানক দৃশ্য দেখাইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি রাক্ষসীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ ধ্বংশ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে, অতি বৃহৎ বৃক্ষ সকল ছিন্ন মূল হইয়া বায়ুবেগে তাড়িত হইতেছে, সম্মুখে পদ্মা উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গ করিতেছে; সন্ন্যাসিনী ত্রিশূলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে নৌকা ঝড়ে উঠিতেছে পড়িতেছে ডুবু ডবু হইয়াছে। একবার বিদ্যুৎ হইল, সেই আলোকে সন্ন্যাসিনী দেখিলেন নৌকা খানি ডুবিল। তখন তিনি "জয় মা কালি" বলিয়া সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী পদ্মা বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। কে ভাবিয়াছিল যে কোমলকায়া অসামান্যা এক দিন এরূপ কঠিনকায়া হইবে? অভ্যাসে সকলই সিদ্ধ হয়। আট বৎসর ধরিয়া যে কেবল কঠোরতা শিক্ষা করিয়াছে, যে ভয়, লজ্জা, দুঃখ, প্রভৃতিকে দূর হইতে একবারে দূরিভূত করিয়াছে, সে যে সেই প্রলয়-তাড়িতা পদ্মা বক্ষে আনন্দে সন্তরণ করিবে আশ্চর্য্য কি?

অসামান্যা সন্তরণ করিয়া চলিলেন; তিনি যেখানে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হয় তথা হইতে

অর্দ্ধক্রোশ দূরে নীত হইলেন। তত্রাচ বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইলেন না। সাঁতরাইয়া যাইয়া একটী মনুষ্যদেহের কেশ ধরিলেন ও তাঁহাকে লইয়া কূলে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রায় তিনি ঘণ্টা কাল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি কূল পাইলেন। তখন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝড়েরও অনেক অবসান হইয়াছে। প্রথমে যথায় তিনি ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন তথা হইতে বোধহয় দশ ক্রোশ দূরে আসিয়া কূলে উঠিতে সক্ষম হইলেন। অসামান্যা যাহাকে তুলিলেন সে একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। তিনি নিকটস্থ গ্রামে সেই মৃতপ্রায় দেহ লইয়া উপস্থিত হইলেন; গ্রাম এক্ষণে শ্মশান; অনেক ক্লেশে তথায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বালিকাকে চেতনা দানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর বালিকার চেতনা হইল সত্য কিন্তু তাহার বাক্ শক্তি বা শ্রবণ শক্তি কিছুই হইল না। তখন ঝটিকা নিবৃত্তি হইয়াছিল; সন্ন্যাসিনী সেই বালিকাকে আবার ক্রোড়ে লইয়া চলিলেন; ঝড়ে প্রায় সমস্ত প্রদেশ ধ্বংশ করিয়াছিল, তিনি এ কোন্ স্থান এই কথা জিজ্ঞাসা করিবারও লোক পাইতেছিলেন না। পাঁচ ছয় ক্রোশ চলিয়া তিনি একটী স্থানে আসিলেন, দেখিলেন তথায় কেহ কেহ জীবিত আছে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে সেই স্থানের নাম ফরিদপুর। এক্ষণে ফরিদপুর জিলা হইয়াছে!

এই স্থানে এক কুটীরে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী বালিকার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সাত দিবস পরে বালিকার পূর্ব্বজ্ঞান আসিল, সে "মা, মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনী

নানা উপায়ে তাহাকে শান্তনা করিলেন; তখন বালিকা সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কে?" অসামান্যা কহিলেন, "আমি তোমার পিতার সর্ব্বনাশের মূল; তোমার পিতার সর্ব্বনাশ ও প্রাণ নাশ করিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি।" বালিকা কিছুই বুঝিলনা, কেবল সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল; তখন সন্ন্যাসিনী বালিকার সেই গোলাপ বিনিন্দিত গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে। তোমার নাম রাখিলাম, প্রতিহিংসা।" বালিকা বলিল "আমার নাম গুল্‌বাহার।" আজই অসামান্যা তুমি যথার্থ প্রতিহিংসা করিলে।

(৮)

আর কয়েকটী কথা বলিলেই অসামান্যার ইতিহাস শেষ হয়। অসামান্যা মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া যথায় সিরাজকে তিনি প্রথম হস্তে পান, ও যথায় তাঁহার খুল্লতাত সেই অভাগাকে মিরজাফরের হস্তে সমর্পণ করেন, সেই 'ভগবানগোলায়' আসিলেন। কেন আসিলেন তাহা তিনি নিজেই ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত তাঁহার মনে হইয়াছিল যে যদি তথায় সিরাজের কোন আত্মীয় কোন বিপদে পড়িয়া থাকেন তবে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। সিরাজের কাহারও উপকার করিবার ইচ্ছাই এক্ষণে তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি সিরাজের ধ্বংশ সাধন করিয়াছেন, সিরাজের কাহারও উপকার না করিলে তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যাহা হউক তিনি ভগবানগোলায়

আসিলেন ; তথায় আসিয়া যাহা জানিলেন তাহাতে তাঁহার বড় আনন্দ হইল। জানিলেন সিরাজের অসংখ্য বেগম ও বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া মিরজাফরের আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু একজন হয়েন নাই। সিরাজের শত সহস্র দোষ সত্ত্বেও তিনি সিরাজকে যথার্থ ভাল বাসিতেন ও সিরাজকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইনি সিরাজের জনৈকা বেগম ; ইহাঁর বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। ইহাঁর নাম মেহেরজান ছিল, কিন্তু সিরাজ ইহাঁকে 'গুল্‌বাহার' অর্থাৎ 'গোলাপফুল' বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন। সিরাজের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া ইনি একাকিনী সিরাজের অনুসন্ধানে চলিলেন। মিরজাফরের লোকেরা সিরাজকে লইয়া যাইবার দুই ঘণ্টা পর ইনি ভগবানগোলায় উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত শুনিলেন। মেহেরজান তৎকালে প্রায় নয়মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ; এই সংবাদে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, ও দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই একটী কন্যা সন্তানের জন্ম হইল। গ্রামস্থ দয়ার্দ্রচিত্ত একজন রমণী মেহেরজানকে এই অবস্থায় দেখিয়া গৃহে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। মেহেরজান নিজ কন্যাকে সিরাজের প্রিয় নাম 'গুল্‌বাহার' দিলেন। অসামান্যা এই সকল কথা শুনিয়া ব্যথিত ও আহ্লাদিত হইলেন, ভাবিলেন, এইবার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব। এই দুঃখিনী ও তাহার সন্তানের উপকার করিব। কিন্তু হায়, মেহেরজান সন্ন্যাসিনীর আগমন বার্ত্তা শুনিবা মাত্র কন্যাকে লইয়া ভগবানগোলা ত্যাগ করিয়া পলাইল। শুনিয়াছিল যে এই সন্ন্যাসিনীই তাহার সিরাজকে ধরাইয়া দিয়াছে। অসামান্যা পরদিবস মেহেরজানের

পলায়ন সংবাদ শুনিলেন, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়া পারি ইহাদের উপকার করিব। মেহেরজানের অনুসন্ধানে তিনি সেই দিবসই যাত্রা করিলেন। তাহাদিগকে ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, গাজিপুর, ইত্যাদি নানা স্থানে পাইলেন, কিন্তু তিনি যেই সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন, মেহেরজানও অমনি তাহার কন্যা লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। এইরূপে তিনি সাত বৎসর মেহেরজানের পশ্চাৎ রহিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও তাহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। গাজিপুর হইতে মেহেরজান নৌকা যোগে চট্টগ্রামে চলিল; তথায় তাহার এক ভ্রাতা ছিলেন। অসামান্যাও পদব্রজে পদ্মার কূলে কূলে চলিলেন। ফরিদপুরের নিকট আসিয়া ঝড় উঠিল,—সেই ঝড়ে মেহেরজানের নৌকা ডুবিল; নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া অনেক কষ্টে অসামান্যা গুল্‌বাহারকে বাঁচাইলেন; মেহেরজানকে পারিলেন না, মেহেরজান মরিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে পাঠক তাহা অবগত আছেন।

অসামান্যা "গুল্‌বাহারের" নাম "প্রতিহিংসা" রাখিয়া তাহাকে শাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অসামান্যা শীঘ্রই ফরিদপুর প্রদেশে একজন দেবী বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন; লোকে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল; তিনি বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য করেন, বিপদে পড়িলে লোকের সাহায্য করেন, কালী বেশে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করেন।

প্রতিহিংসার বয়স পঞ্চদশ হইলে হরিহর মিত্র নামক এক যুবকের সহিত অসামান্যা প্রতিহিংসার বিবাহ দিলেন। সে

জানিত না যে সে বঙ্গেশ্বরের কন্যা; সে যে মুসলমান কন্যা ক্রমে তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। হরিহরও অসামান্যার একজন শিষ্য, প্রতিহিংসাকে বড় ভাল বাসিতেন, প্রতিহিংসাও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত, দুই জনের বিবাহ হইল, তাহারা গৃহী হইল। ইহাঁদের বিবাহের তিন বৎসর পরে বিনা পীড়ায় অসামান্যার মৃত্যু হইল। ইহাঁদেরই প্রপৌত্র রামহরি মিত্র ফরিদপুর ত্যাগ করিয়া গিয়া নির্জ্জনে কোটালিপাড়ের বিলে যাইয়া বসতি করেন। ক্রমে সময়ে বঙ্গদেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, অসামান্যার পূজা অনেকে ভুলিয়া গেল, কেবল প্রতিহিংসার বংশ পরম্পরায় তাঁহার পূজা চলিয়া আসিল। আজ প্রায় বঙ্গে একশত বৎসর গত হইয়া গিয়াছে অসামান্যা এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণেও তাঁহার পূজা নির্জ্জনে হইতেছে। কোটালিপাড়ের বিলে হরিহর মিত্রের বংশ সম্ভূতগণ এখন ও অসামান্যার পূজা করিতেছেন। আমাদেরও ইচ্ছা হইয়াছে যে এই দেবীর পূজা করি। জিজ্ঞাসা করি, তোমাদেরও কি এই দেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে না?

ফুলকুমারী।

(১)

আরাবলী পর্ব্বতের উপর "রামেশ্বর" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ পল্লীর ঠিক মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ পার্ব্বতীয় বৃক্ষ,—ঐ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশে একটী প্রস্তরের বেদি নির্ম্মিত আছে। নিকটস্থ অসংখ্য সধবা স্ত্রীলোক স্বামী ভক্তি বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া এই বৃক্ষতলে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া যায়; সুতরাং বৃক্ষের নিম্নস্থ বেদির উপরে রাশি রাশি পুষ্প ও অসংখ্য সিঁন্দুরের ফোঁটা সকল সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের এমন স্ত্রীলোক কেহ নাই যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই এই বৃক্ষতলে আসিয়া সে পূজা না দিয়া গিয়াছে। প্রত্যহই, অসংখ্য স্ত্রীলোক এই বৃক্ষতলে আইসে ও ফুল দিয়া চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন এই বৃক্ষ নিম্নে "ফুলকুমারীর মেলা" বলিয়া এক বৃহৎ মেলা হয়; নানা দিক দেশান্তরের অসংখ্য লোক এই মেলায় আসিয়া একত্রিত হইয়া থাকে। সাত দিবস ধরিয়া মহা ধুমধাম ও অসংখ্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হয়।

যাঁহার উদ্দেশে প্রতি বৎসর নির্জ্জন পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশে এই মেলা হইতেছে, যাঁহার উদ্দেশে রমণীগণ আগ্রহের সহিত বৃক্ষ নিম্নে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, আমরা অদ্য সেই ফুলকুমারীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে যাইতেছি।

(২)

আরাবলী পর্ব্বতের উপরিস্থ "রামেশ্বর" নামক পল্লীতে প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল, ছকন লাল বলিয়া এক ব্যক্তি বাস করিতেন; ইহাঁর কয়েকটী সন্তানাদি হইয়াছিল। যে ফুলকুমারীর কথা আমরা বলিতে যাইতেছি, তিনি ইহাঁরই কনিষ্ঠা কন্যা। এই গ্রামে সমরিলাল বলিয়া এক ব্যক্তির বাটী ছিল, সকলেই জানিত যে ইহাঁর ন্যায় ধনী সে প্রদেশে আর কেহই ছিল না; ইহাঁর একটী মাত্র সন্তান হইয়াছিল; সমরি সন্তানের নাম মঙ্গলদাস রাখিয়াছিলেন। সমরিলাল প্রায়ই বাটিতে থাকিতেন না, তাঁহার পাটনা নগরে ব্যবসাদি ছিল, তিনি সপরিবারে তথায়ই থাকিতেন; কদাচিৎ দুই বৎসর তিন বৎসর পরে এক একবার বাটী আসিতেন; এইরূপে তাঁহারা সপরিবারে একবার বাটী আসিলে সমরিলাল ফুলকুমারীকে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীও ফুলকুমারীকে দেখিলেন। ফুলকুমারীর ন্যায় সুন্দরী সে প্রদেশে আর ছিল না,—ফুল কুমারীর ন্যায় শান্ত সুশীলা বালিকাও সহজে মিলে না; সুতরাং ফুলকুমারীর পিতা সম্ভ্রান্ত না হইলেও সমরিলাল পুত্রের সহিত ফুলকুমারীর বিবাহ দিবার মনন করিলেন। ছকনলাল কন্যার এরূপ সম্বন্ধ জুটিবে কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সুতরাং মহানন্দে কন্যার বিবাহে সম্মত হইলেন; তৎপরে মহা সমারোহে মঙ্গল দাসের সহিত ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর নূতন বধূকে লইয়া সমরিলাল সপরিবারে পাটনায় প্রস্থান করিলেন। ফুলকুমারীর বিবাহের দুই বৎসর পরে একটি চিত্র আমরা পাঠকদিগকে দেখাইব।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা, পাটনা নগরী, সমরিলালের বৃহৎ অট্টালিকায় একটি অতি মনোহর প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া ফুল কুমারী কয়েকটি সখীর সহিত তাস ক্রীড়া করিতে ছিলেন। সমরিলালের ধন অপরিমিত, তাঁহার একটি মাত্র সন্তান, তিনি স্বয়ং যদিও বিলাসে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না, কিন্তু পুত্রকে বিলাস সাগরে মগ্ন হইতে দিয়াছিলেন। বধুর জন্যই বোধ হয় মাসে তিনি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন; ইহাতেই বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ফুলকুমারী কিরূপ সজ্জিত গৃহে কিরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া উপবিষ্টা ছিলেন। ফুলকুমারী তাস খেলিতেছিলেন, এমন সময়ে মঙ্গলদাস তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখীরা যে যাহার তাস ফেলিয়া তথা হইতে পলাইল, ফুলকুমারী উঠিয়া স্বামীর নিকট আসিলেন: আসিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন, "আজ তুমি এত বিষন্ন কেন?" মঙ্গলদাস কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ফুলকুমারী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, "কি হইয়াছে? আমায় বলিবে না?" তখন মঙ্গলদাস প্রিয়তমার হাত ধরিয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "বিষন্নতার কারণ অধিক কিছুই নহে, কেবল দিন কতকের জন্য তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া।" ফুলকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে কি? আমি যেতে দিব না।" মঙ্গলদাস একটু বিষাদ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "না গেলে নয়, বাবা বলিতেছেন, কি একটা ব্যবসায়ের কাজ আছে। মুরসিদাবাদে যেতে হবে, মুরসিদাবাদ তত দূর নয়, শীঘ্রই ফিরিতে পারিব।" ফুলকুমারী বলিল, "তবে আমায় নিয়ে চল।" মঙ্গল দাস বলিলেন, "সে কি হয়।" কিন্তু ফুলকুমারী তাহা শুনিল

না, স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; মঙ্গল দাসেরও চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে নয়নাশ্রু পতিত হইয়া ফুলকুমারীর কেশ শিক্ত করিতে ছিল। এই দৃশ্য কত মনোহর, কত হৃদয়ানন্দ-দায়ক; কিন্তু এ সংসারে যেমন মানব জীবন এক সময়ে সুখের তরঙ্গ উর্দ্ধে উত্থিত হয়, আর এক সময়ে দুঃখের পতনে তেমনি নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। আমরা পাঠকদিগকে ফুল কুমারীর জীবনের আর একটি দৃশ্যও দেখাইতেছি।

(৩)

এই ঘটনায় সাতবৎসর পরে এক দিন সেই রাত্রি আট ঘটিকার সময় প্যাটনা নগরীর একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার একটি অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ভিতরে বসিয়া ফুলকুমারী কি রন্ধন করিতে ছিলেন। পার্শ্বে একটি তিন চারি বৎসরের বালক বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিল; তাহার ক্রন্দনে ব্যস্ত হইয়া ফুলকুমারী কি করিতে কি-করিয়া ফেলিয়া হস্ত দগ্ধ করিলেন; যাতনায় তাঁহার চক্ষুদিয়া জল পড়িল; কিন্তু তিনি অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া বালকের সম্মুখে অর্দ্ধদগ্ধ অতি কদর্য্য চাউলের দুটি অন্ন ও ঐ রূপ কদর্য্য তর-কারি স্থাপন করিলেন; বালক দুইবার অন্ন মুখে দিয়া বলিল "খাব না।" তৎপরে ভয়ানক চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল; তাহার ক্রন্দনে ফুলকুমারী অতিশয় অস্থির হইয়া বলিলেন, "বাবা, খাও, আর কোথায় কি পাব?" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ফুলকুমারীর চক্ষু দিয়া জল অগ্নির ন্যায় উষ্ণ হইয়া বহির্গত হইতে লাগিল, তিনি হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে গোপন করিয়া পুত্রকে শান্তনা করিতে লাগিলেন। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে তাঁহার

ক্রোড়ে নিদ্রিত হইল; তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া এক মলিন শয্যায় পুত্রকে শয়ন করাইলেন। তৎপরে আসিয়া গবাক্ষের ধারে বসিলেন; প্রতি শব্দেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘটিকা পরে, কাহার পদ শব্দ শ্রুত হইল, তৎপরে মঙ্গল দাস কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, টলিতে টলিতে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; ফুলকুমারী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া যাইয়া তাহার হাত ধরিলেন, তৎপরে তাঁহার গলা জড়াইয়া সেই সুরার বিকট গন্ধে আকুলিত ওষ্ঠ চুম্বন করিলেন। কিন্তু মঙ্গল তাঁহাকে এক ধাক্কা মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন "যা—যা—ভাল লাগে না।" ফুলকুমারী মিনতি স্বরে বলিলেন "আস্তে,—লক্ষ্মণ ঘুমচ্চে।" "লক্ষ্মণ কে? লক্ষ্মণ বুঝি তোর—।" এই বলিয়া মঙ্গল দাস ফুলকুমারীর চুল ধরিলেন, তৎপরে কুৎসিৎ গালাগালি দিয়া বলিলেন, "কি রে ধেছিস দে।" ফুলকুমারী বলিলেন "বসো, বসো, আমি সব আনৃচি, তুমি যা যা ভাল বাস তাই রেঁধেছি।" মঙ্গল দাস বসিতে যাইয়া বসিতে পারিলেন না, একেবারে পড়িয়া গেলেন। ফুলকুমারী ব্যাকুল ভাবে গিয়া সেই সুরামত্তকে তুলিয়া তাঁহাকে বসাইয়া জল লইয়া আসিলেন, তৎপরে তাঁহার হস্ত পদাদি ধৌত করিতে গেলেন, কিন্তু মঙ্গল দাস তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য; হস্তে ও পদে জল লাগায় বোধ হয় তাঁহার ক্লেশ হইল, তিনি সবলে ফুল কুমারীর বুকে এক পদাঘাত করিলেন;—ফুলকুমারী সহসা আঘাতিত হইয়া ভূমে পতিত হইল ও মস্তক সজোরে ইষ্টকে আঘাতিত হওয়ায় তাঁহার মস্তক কাটিয়া শোণিত নির্গত হইল; কিন্তু তিনি একবারও সেদিকে ফিরিয়া দেখিলেন না, ব্যস্ত হইয়া নিকটে

আসিয়া বলিলেন "তোমার পায় লাগে নাই তো?" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে? মঙ্গল দাস ফুলকুমারীর শরীরে নক্কার করিতে করিতে তাঁহার শরীরে ভর দিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন ফুলকুমারী স্বামীর মস্তক ধীরে ধীরে জানুপরে রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত কেশ এই সময়ে শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল।

(৪)

ফুলকুমারী শ্বশুরালয়ে তিন বৎসর মহাসুখে বাস করিলেন, তাহার একটী পুত্র হইল। তাহার কোনই অভাব ছিল না, তাহার অর্থের উপর শয্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহাকে যত ভাল বাসিতেন, এত ভাল কখন শ্বশুর শাশুড়ী বধূকে ভাল বাসিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে যত ভাল বাসিতেন, তত ভাল কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিন বৎসর ফুলকুমারী দুঃখ কাহাকে বলে তাহা বুঝে নাই। দুঃখ বলিয়া যে পদার্থ জগতে আছে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। যাহার কোনই অভাব নাই, তাহার আবার দুঃখ কি? মানবের যদি চিরকাল সমান যাইত তাহা হইলে আর দুঃখ কি?

ফুলকুমারীর বিবাহের তিন বৎসর পরে সমরিলাল প্রাণত্যাগ করিলেন; কয়েক মাসের মধ্যে মাতারও প্রাণ বিয়োগ হইল। মঙ্গলদাস তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অসংখ্য বন্ধু জুটিল; তিনি চিরকাল পিতার আদর পাইয়া আসিয়াছেন, তবে কোন বিষয়ের সীমার বহির্ভাগে তিনি পিতার বর্ত্তমানে যাইতে পারেন নাই;—

এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণীত হইল। সময় বুঝিয়া যেরূপ হইয়া থাকে, কয়েকটী বন্ধুজুটায় তাঁহার সর্ব্বনাশের দ্বার উম্মুক্ত হইল; তিনি আমোদ প্রমোদে মাতিলেন; তিনি বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া ফুলকুমারীকে ভুলিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি একটী বারবনিতাকে লইয়া মত্ত হইলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে সুরা পানও অরম্ভ করিলেন। ফুলকুমারী দিন রাত্রি তাঁহাকে দেখিতেই পাইত না. সে কিছুই তাঁহাকে বলিতে পারিল না, সে বানবিদ্ধা পারাবতের ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। কতবার তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, কত কাঁকুতি মিনতি করিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইল, কিন্তু মঙ্গল দাসের তাঁহার এক সময়ের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম ফুলকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবারও সময় হইল না। যখন ফুলকুমারী দেখিল যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তখন সে তাঁহার সহিত যেমন করিয়া হয় দেখা করিবার মনস্থ করিল। সে সেই দিবস হইতে সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। মঙ্গলদাসকে সে একাকী আর দেখিতে পায় না, অবশেষে এক দিন পাইল। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঙ্গলদাস ব্যস্তভাবে বাটীর পশ্চাতস্থ উদ্যানের দিকে যাইতেছিলেন, ফুলকুমারী গিয়া তাঁহাকে পথে ধরিল, বলিল "আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? যদি অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা কর, না বুঝিয়া কি করিয়াছি,—এক বার সেইরূপ আমাকে আদর কর।" মঙ্গল দাস বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "যাও যাও, বিরক্ত করিও না. আমার কাজ আছে।" ফুলকুমারী এবার একেবারে তাঁহার দুটী হাত ধরিল, প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কি

দোষে তোমার ভালবাসা আমি হারাইলাম? স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর কি আছে? যদি আমাকে এরূপ করিবে তবে বাঁচাইয়া রাখিয়া আমাকে কষ্ট দেওয়া কেন,—আমায় মারিয়া ফেল না কেন?" মঙ্গলদাস বলিলেন "তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার কি কোন অযত্ন হইতেছে? তুমি যত টাকা ইচ্ছা তাহাইতো ব্যয় করিতে পাইতেছ।" ফুলকুমারী বলিল "আমি কি কখন তোমার নিকট ধন চাহিয়াছি, আমি কি ধনের প্রত্যাশী? তুমি ধন যাহা ইচ্ছা কর, আমি কি তাহাতে কোন কথা বলিতেছি? তুমি আমাকে একবার সেই রকম আদর করিয়া ডাক।" মঙ্গলদাস বলিলেন "তুমি কি আমাকে তোমার সঙ্গে দিন রাত থাক্‌তে বলনা কি?" ফুল কহিল "কেন থাকিবে না, বল তোমার জন্য আমি কি না করিতে পারি? তুমি কেন সেখানে যাও বল, আমি গান নাচ সব শিখি;—তুমি সেখানে কেন যাও? তোমার জন্য বল মদও খাইতেছি।" মঙ্গলদাস বলিলেন, "দেখ ওসব আর এখন বুড়ো বয়সে ভাল লাগে না, এক সময়ে ভাল লাগিত। ছেড়ে দেও, আমায় বিরক্ত করিও না।" এবার ফুলকুমারী একেবারে পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বল আর আমাকে ছেড়ে থাক্‌বে না, প্রতিজ্ঞা কর, না হলে কখন ছাড়ব না। পার মেরে ফেলে চলে যাও।" "আমার এমন প্যানপেনে মেয়ে ভাল লাগে না" এই বলিয়া মঙ্গলদাস সত্যসত্যই সবলে পদ উন্মুক্ত করিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন; তৎপরে ফুলকুমারী আর তাঁহার দেখা পায় না।

দুই বৎসরের মধ্যে মঙ্গলদাস সমরিলালের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে নষ্ট করিলেন, তৎপরে ঋণ করিতে আরম্ভ

করিলেন ; যে বারবনিতার পদে তিনি ধন মান প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থের শেষ হইয়াছে দেখিয়া সে তাঁহাকে দূর করিয়া দিল ; তখন ঋণ করিয়া দিন কতক গেল, তৎপরে ঘোর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। এদিকে মঙ্গলদাসের অবস্থা যতই শোচনীয় হইতে লাগিল, তাঁহার সুরাপান ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈতৃক বাটী গেল, সব গেল। তখন মঙ্গলদাস এক জঘন্য বাটীতে বাস করিতে বাধ্য হইলেন ; তাঁহার শত শত দাস দাসী বিদায় হইল ; যে ফুলকুমারী ক্লেশ কি জানিত না, সে স্বহস্তে পতিপুত্রের আহার রন্ধন করিতে লাগিল। আমরা পাঠকদিগকে এ দৃশ্যও দেখাইয়াছি ; আর অধিক দেখাইবার ইচ্ছা নাই।

মঙ্গলদাস নিজ শরীরের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার এরূপ সুস্থ শরীরে এত দিন থাকাই একরূপ আশ্চর্য্য ; কিন্তু আর অধিক দিন থাকা হইল না। মঙ্গলদাস নানা পীড়ায় জড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন ; ফুলকুমারীর লক্ষ টাকার অলঙ্কারের অবশিষ্ট দুই বলয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে সে তাহাই বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা করিতে লাগিল। মঙ্গলদাসের অন্যান্য পীড়া আরোগ্য হইল সত্য, কিন্তু তাঁহার কুষ্ঠের চিহ্ন দর্শন দিল। তিনি সেই যে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন আর উঠিতে পারিলেন না। ফুলকুমারী নিজ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিল ; তৎপরে দেখিল ভিক্ষা বা দাসীবৃত্তি না করিলে স্বামী পুত্র উভয়েরই অনাহারে প্রাণ যাইবে। তাহার হস্তের বলয় বিক্রয়া অর্থ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ছিল। সে আর সময় নষ্ট করা উচিত

নহে ভাবিয়া স্বামী পুত্রকে লইয়া কাশী আসিল। এই খানে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের বাটী দাসীকার্য্যে নিযুক্ত হইল; সন্তানকে পাঠশালায় দিল, আর সেই গলিত পলিত স্বামীর দিবারাত্রি পরিচর্য্যা করিতে লগিল। এত দিনে মঙ্গলদাসের চৈতন্য হইল, তাঁহার যে এ দুর্দ্দশা হইয়াছে ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহেন; তিনি ভাবিলেন তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অর্থে শৃগাল কুকুর খাইয়াছে, আজ তাঁহার পুত্র ও স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা! সমরিলালের পুত্রবধূ আজ দাসীবৃত্তি করিতেছে, তাঁহাকে তিনি এত কষ্ট দিয়াছেন, সেই তাঁহার এত পরিচর্য্যা করিতেছে—বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা বিরক্তি নাই। এক্ষণে আর তাঁহার চলৎশক্তি ছিল না; তিনি, কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া থাকিতেন আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরত জল ঝরিত। ফুলকুমারী যখনই ইহা দেখিত তখনই অমনি দৌড়াইয়া আসিয়া অঞ্চলে চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া সেই গলিত ওষ্ঠে সাদরে চুম্বন করিয়া বলিত "যা হবার হয়ে গেছে, —সে ভাবনা আর কেন? তোমার ভালবাসাই আমার ধন, মান সর্ব্বস্ব। তুমি যদি অমন কর তবে আমি কাঁদিব। আমাদের এখন আর কিসের কষ্ট?" হায়, মঙ্গলদাসের হৃদয় তাহা এখন বুঝে কই? তাঁহার চক্ষুজল থামে কই।

এইরূপে ফুলকুমারী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীকে লইয়া প্রায় ১০ বৎসর কাশীতে অতিবাহিত করিল। সে তাহার পূর্ব্ব সুখ ভুলিয়া এখন যে সে স্বামী পাইয়া সুখে আছে, তাহাই ভাবিত; কখনও কখনও পুত্রের কোন কষ্ট হইলে তাহার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িত। এক দিন তাহার সেই সন্তান কি চাহিয়াছিল কিন্তু

দিতে না পারায় সে সন্তানের সম্মুখেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাতে তাহার পুত্র তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল "মা দুঃখ কি, আমি আবার তোমায় তেমন করিব।" সেই পর্য্যন্ত সে আর কখন পুত্রের সম্মুখে চক্ষুজল ফেলিত না। এইরূপে একরূপ সুখে দুঃখে সে দশ বৎসর কাশীতে কাটাইল। এক্ষণে লক্ষ্মণের বয়স পঞ্চদশ বৎসর; সে অতি যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিল; কাশীতে তখন তাহার ন্যায় বালক আর কেহ ছিল না। ফুলকুমারী দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা পাইত তাহাতে তাহাদের ভরণ পোষণ হওয়া দায়,—সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার জন্য সে কিছুই ব্যয় করিতে পারিত না। লক্ষ্মণ তাহার পিতামহের ঐশ্বর্য্য, পিতার কার্য্য ও মাতার ক্লেশ অনেক শুনিয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল মাতার কষ্ট আমি দূর করিবই করিব। এই জন্যই সে বিদ্যা শিক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। যখন দেখিল মাতা আর তাহার পাঠের জন্য কিছুই দিতে পারেন না, তখন সে এক দিবস কাশীর সেই সময়ের পণ্ডিত রামানন্দ স্বামী মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঠের ইচ্ছা জানাইল। তিনি ক্ষুদ্র বালকের উৎসাহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া পাঠদানে সম্মত হইয়া শিষ্যরূপে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই লক্ষ্মণের নিজ পাঠে মনোযোগে ও গুরুর প্রতি ভক্তিতে রামানন্দ স্বামী তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এই সকল দেখিয়া তিনি দ্বিগুণ যত্নে লক্ষ্মণকে পড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি লক্ষ্মণের নিকট তাহাদের পূর্ব্বাবস্থার কতক শুনিলেন, তাহার পিতার কুষ্ঠরোগের কথাও শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, "এ কথা তুমি এত দিন আমায়

বল নাই কেন? আমি এক মাসে তোমার পিতার পীড়া আরোগ্য করিব।” তৎপরে সেই দিন রামানন্দ স্বামী ফুলকুমারীদিগের কুটীরে আসিয়া লক্ষ্মণের পিতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন; পরে নানা কথাচ্ছলে তিনি ফুলকুমারীর নিকট তাহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল জানিয়া লইলেন, যাইবার সময় বলিলেন “তোমার ন্যায় পতিব্রতা আর দেখি নাই, এমন পতিব্রতার সন্তান না হইলে কি কখন এমন হয়।” রামানন্দ স্বামী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। এক মাস হইতে না হইতে ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মঙ্গলদাসের গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হইল। তখন মঙ্গলদাস ফুলকুমারীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “ফুল,—বল বল, তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ?” ফুল এত দিন কাঁদে নাই, সেই দিন কাঁদিল; কাঁদিয়া স্বামীর বুক ভাসাইয়া দিল। তাহার পর তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া রামানন্দস্বামীর কুটীরে গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার দয়ার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, ইহাতে মহা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কুটীর হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন।

(৫)

কিছু দিন পরে কাশীতে জয়পুরের রাজা আসিলেন। রামানন্দ স্বামী তাঁহার গুরু। রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে স্বামীজী রাজাকে লক্ষ্মণের সমস্ত গুণ ও তাহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, বিশেষ তাহার মাতার পতিভক্তির কথা কহিয়া বলিলেন, “এই বালককে আপনাকে লইতে হইবে;—অধিক বলা বাহুল্য; এ নিজ ক্ষমতায় আপনার পদ উন্নতি

করিবে।” রাজা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন, “বালককে উপস্থিত তিন শত মুদ্রা বেতনে আমার মনসবদার করিলাম; পরে আপনি যেমন বলিতেছেন ক্ষমতা থাকে আপনিই পথ করিয়া লইবে।” লক্ষ্মণ, ফুলকুমারী ও মঙ্গলদাস পর দিবস রামানন্দ স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া জয়পুর যাত্রা করিলেন।

এক সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল এতদিনে তাহাই পুনরুদিত হইতে আরম্ভ করিল। ফুলকুমারীর সকল কষ্ট দূর হইল; লক্ষ্মণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা পালন করিল; মাতা যাহা ছিলেন সে তাঁহাকে তাহাপেক্ষা বড় করিল। রামানন্দ লক্ষ্মণকে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইল না; লক্ষ্মণ জয়পুরে পাঁচ বৎসর আসিতে না আসিতে সে মন্ত্রিত্ব পদে অধিরূঢ় হইল। আমরা আর ফুলকুমারীর সুখ বর্ণন করিতে যাইব না। এত স্বামীভক্তির যদি পুরস্কার না হইবে তাহা হইলেতো বলিতাম বিধাতা উপরে নাই।

মহা সুখে স্বামী পুত্র লইয়া ফুলকুমারী চারি বৎসর কাটাইলেন, তৎপরে প্রায় বিনা ব্যাধিতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল; তিনি স্বামীর পদতলে মস্তক রাখিয়া হাসিতে হাসিতে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখধামে প্রস্থান করিলেন। তাহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে মঙ্গলদাস মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; তখন মহা সমারোহে লক্ষ্মণ পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি করিলেন।

এই সকল ঘটনায় প্রায় পাঁচ সাত বৎসর পরে রামানন্দ স্বামী জয়পুরে আসিলেন তিনি আসিয়াই লক্ষ্মণকে অতি-

শয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "তুমি অতি পাষণ্ড, তুমি এমনি পতিব্রতা মাতার একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিবার চেষ্টা কর নাই!" লক্ষ্মণ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "কি করিতে আজ্ঞা করেন?" রামানন্দ বলিলেন, "যেখানে তোমার মাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রতি বৎসর সেই স্থানে তাঁহার নামে এক মেলা কর; তাঁহার নামে সেই স্থানে এক বৃক্ষ রোপন কর; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে যে সেই বৃক্ষতলে, পুষ্পাঞ্জলি দিবে সে তোমার মাতার চরণে অঞ্জলি দিবে। তাহার স্বামী ভক্তি আপনি হইবে; এরূপ পতিব্রতা সতী আর কি শীঘ্র জন্মিবে?" রাজা রামানন্দের কথায় নাচিয়া উঠিলেন। সেই বৎসর মহা সমারোহে রামেশ্বরে প্রথম "কুলকুমারীর মেলা" হইল। সেই পর্য্যন্ত সেই মেলা হইয়া আসিতেছে; সেই পর্য্যন্ত কত শত রমণী কুলকুমারীর নামে বৃক্ষতলে পুষ্প দিতেছে। আমরা বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, যতদিন এ পৃথিবী থাকিবে, ততদিন যেন কুলকুমারীর মেলাও থাকে।

লক্ষ্মণের কি হইল? লক্ষ্মণ মহাসুখে কাটাইয়া গেলেন। তাঁহার বংশ এখনও [illegible] বলিয়া জয়পুরে পরিচিত গণ্য ও মান্য হইতেছে।

সম্পূর্ণ।